কুরআন হাদীসের আলোকে

পারিবারিক জীবন

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)

অনুবাদ

মাওলানা আবু তাহের রাহমানী

পরিবেশনায়

বাগদাদ লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

হাদীস—১

হাকিম ইবনে মু'আবিয়া (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতি স্ত্রীদের কি হক? তিনি ইরশাদ করলেন– স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক হলোঃ ১. তোমরা যখন খাবার খাবে, তাদেরকেও খাওয়াবে। ২. যখন বস্ত্র পরিধান করবে, তাদেরকেও পরাবে। ৩. (অন্যায়ের জন্য শাসন করতে গিয়ে) তাদের মুখমন্ডলে আঘাত করবে না। ৪. তাদেরকে অভিশাপ দিবে না। ৫. স্ব-গৃহে ব্যতীত তাদের সাথে মেলামেশা ত্যাগ করবে না। (অর্থাৎ, স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে স্বগৃহ ত্যাগ করবে না।) (আবু দাঊদ)

হাদীস—২

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যাম'আ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের ন্যায় প্রহার না করে। কেননা দিবস শেষ হওয়ার পর তার সাথে তাকে শয্যা গ্রহণ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

হাদীস—৩

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার উপদেশ মেনে চলো। কেননা নারী জাতিকে বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তাদেরকে (সম্পূর্ণরূপে) সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তাদেরকে ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হলো, তালাক প্রদান করা। আর যদি আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। এজন্য আমি তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ফায়দা ঃ সোজা করার অর্থ হলো, তাদের কোন আচরণ-উচ্চারণই নিজের (স্বামীর) মনের খেলাফ হতে না দেয়া। কেননা এ ব্যাপারে চেষ্টা করা নিরর্থক। আর যদি এ নিয়ে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করো, তাহলে তালাক প্রদানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এজন্য সাধারণ বিষয়ে স্ত্রীর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা

উচিত। তাছাড়া অতিরিক্ত কঠোরতা ও রুক্ষ আচরণের ফলে শয়তান মহিলাদের অন্তরে দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কল্পনা ও কুচিন্তা সৃষ্টি করে।

হাদীস—৪

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মায়মুনা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ সাহাবী) উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উভয়ে পরদার ভিতরে চলে যাও। আমরা আরয করলাম, তিনি তো অন্ধ মানুষ, না আমাদেরকে দেখেন আর না আমাদেরকে চেনেন। তখন তিনি বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখছো না? (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ স্ত্রীকে গায়রে মাহ্‌রাম থেকে পরদার মধ্যে রাখা, যেন একজন অপরজনকে দেখতে না পায়, এটাও স্ত্রীর একটি হক। এতে স্ত্রীর দ্বীন রক্ষা পায় এবং সে পরদাহীনতার ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। এতে তার পার্থিব উপকারও রয়েছে। কেননা কোন বস্তুর বিশিষ্ট্যতা যত অধিক হবে, তার প্রতি আকর্ষণও ততো অধিক হবে। পরদার মাধ্যমে যেহেতু স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এক প্রকার বিশিষ্ট্যতা অর্জিত হয়,[১] তাই তার প্রতি স্বামীর আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। ফলে স্ত্রীর হক অধিক পূর্ণ হয়। এতে প্রমাণিত হলো, পরদা স্ত্রীর পার্থিব কল্যাণ লাভেরও একটি মাধ্যম।

হাদীস—৫

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আমি কারোর প্রতি কোন মানুষকে সিজদা করার হুকুম করতাম, তাহলে স্ত্রীর প্রতি হুকুম করতাম স্বামীকে সিজদা করার।

হাদীস—৬

ইবনে আবী আওফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! স্ত্রী যে পর্যন্ত না আপন স্বামীর হক আদায় করবে, তার প্রতিপালকের হক আদায় হবে না। (ইবনে মাজাহ)

---

১. পর্দা যেমন সকল গায়রে মাহ্‌রামের দৃষ্টি থেকে নারীকে আড়াল করে একমাত্র স্বামীর দৃষ্টির জন্য বিশিষ্ট করে দেয়, তদ্রূপ তার দৃষ্টিকে সকল গায়রে মাহ্‌রাম থেকে ফিরিয়ে একমাত্র স্বামীর জন্য বিশিষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ, স্ত্রীর প্রতি কেউ তাকাতে পারবে না স্বামী ছাড়া এবং স্ত্রী নিজেও কারো প্রতি তাকাতে পারবে না স্বামী ছাড়া। এটাই স্বামীর প্রতি নারীর বিশিষ্টতার অর্থ।

ফায়দা ঃ শুধু নামাজ, রোজা আদায় করেই কোন নারী যেন মনে না করে যে, সে মহান আল্লাহর হক আদায় করে ফেলেছে। কেননা স্বামীর হক আদায় করাও আল্লাহ তা'আলার একটি হুকুম। সুতরাং কোন স্ত্রী যে পর্যন্ত স্বামীর হক আদায় না করবে, ততক্ষণ আল্লাহর হক পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হবে না।

হাদীস—৭

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম নারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, ঐ নারী যাকে দেখলে তার স্বামী আনন্দিত হয়, তাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং নিজের ও নিজের সম্পদ সম্পর্কে এমন কিছু করে না যার কারণে তার স্বামী অসন্তুষ্ট হয়। (নাসাঈ)

ফায়দা ঃ দ্বীনি ও দুনিয়াবী যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরিপূর্ণ সম্পর্ক ও ভালোবাসা অটুট থাকা। আর পরিপূর্ণ সম্পর্ক ও ভালোবাসা তখনি অটুট থাকবে, যদি স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করে। বস্তুতঃ ইসলাম স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য যে হক ও অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা পূরণ করার মাধ্যমেই পারিবারিক জীবন সুখকর হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিয়ের পর পৃথক ঘরে থাকা আবশ্যক

এক. পৃথক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে একসাথে থাকা মোটেই সঙ্গত নয়। কারণ, এর ফলে পারিবারিক জীবনে বহু রকমের সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা প্রকাশ পেতে থাকে অচিরেই।

দুই. পারিবারিক ঝগড়া-কলহ থেকে বেঁচে থাকার একটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো– পরিবারের সকলে মিলে এক ঘরে এক সাথে না থাকা। একাধিক মহিলা এক ঘরে থাকার ফলেই যতসব ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত হয়।

তিন. জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে সকলে মিলে একঘরে একসাথে থাকতো। ফলে পরিবারে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। আমি (হযরত থানবী রঃ) তাদের পরামর্শ দিলাম, তোমরা পৃথক হয়ে যাও। একসাথে থাকলে ঝগড়া-কলহ হতে থাকে। সাথে সাথে আমার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করলাম। আমার পরামর্শ অনুযায়ী তারা পৃথক হয়ে গেলো। এজন্য পরিবারে মারাত্মক রকমের হট্টগোলও হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের মা যখন জানতে পারলো, এটা আমার পরামর্শ, তখন পরিস্থিতি শান্ত হলো। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি সকলের খরচ পৃথক করে দিলো। ফলে পরিবারের মধ্যে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে এলো এবং ঝগড়া-কলহও বন্ধ হলো।

বিয়ে করার সাথে সাথে মা-বাবা হতে ছেলে পৃথক হয়ে যাওয়াই বর্তমান যুগের জন্য অধিক সমীচীন। এতে ছেলে ও মা-বাবা উভয়েরই শান্তি। আমি মিরাঠে এক পরিবারের অবস্থা দেখেছি। উক্ত পরিবারে ঝগড়া-কলহ, বিশৃংখলা ও মনোমালিন্য সর্বদা লেগেই থাকতো। আমার সাথে সেই পরিবারের একজনের তা'আল্লুক (ইসলাহী সম্পর্ক) ছিলো। সে আমাকে পত্র দ্বারা তার পরিবারে প্রতিনিয়ত ঝগড়া-কলহ লেগে থাকার কথা জানালো।

উত্তরে আমি তাকে পরামর্শ দিয়ে লিখলাম— "তুমি এক্ষুণি আলাদা ঘর ভাড়া করে পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যাও।" আমার পরামর্শ মতে সে ঘর ভাড়া করে আলাদা থাকতে শুরু করলো। ফলে পরিবারে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে এলো এবং যাবতীয় ঝগড়া-কলহেরও অবসান হলো।

আমার পরামর্শ হলো, বিয়ের পর মা-বাবার সাথে একসঙ্গে থাকবে না। এটাই উভয় পক্ষের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা।

পুত্রবধূকে অনুগত রাখার ব্যবস্থা

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (র)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করলো যে, পুত্রবধূ তার আনুগত্য করে না, তার কথা শুনে না। তখন থানবী (র) বললেন, পুত্রবধূকে অনুগত রাখার একমাত্র ব্যবস্থা হলো– ছেলেকে তার স্ত্রীসহ পৃথক করে দেয়া। তাদেরকে পৃথক করে দাও, এতে তারা তোমাদের অনুগত ও বশীভূত হতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

বর্তমান যুগের নারীরা এত বেশী স্বাধীনতা প্রিয় যে, বিয়ের পর স্বামীগৃহে পদার্পণ করা মাত্রই শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে পৃথক হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বামীর পক্ষ হতে দু'চার টাকাকে তারা শ্বশুরের হাজার হাজার টাকার চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করে। ফলে পরিবারে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া-কলহ ও বিবাদ-বিশৃংখলা।

জনৈক হিন্দু হযরত থানবী (র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার পুত্র ও পুত্রবধূ সম্পর্কে অভিযোগ করলো, তারা সব সময় তাদেরকে কষ্ট দেয়, পুত্রবধূ সংসারে কোন কাজ করে না। ছেলেও সর্বদা উত্ত্যক্ত করে। তখন থানবী (র) বললেন, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, তাদেরকে পৃথক করে দেয়া। তারা পৃথক থাকবে এবং তোমরা পৃথক থাকবে। তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অনেকে সমাজে দুর্নাম হওয়ার ভয়ে মা-বাবা থেকে পৃথক হতে চায় না। মা-বাবার সঙ্গে একসাথে থেকে সর্বদা বিভিন্ন সমস্যা-সংকট ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এটা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা শান্তি ও সুনাম একসাথে পাওয়া যায় না। শান্তি পেতে হলে কিছু দুর্নাম কামাতেই হবে। আর সুনাম লাভ করার চেয়ে শান্তিতে থাকা পারিবারিক জীবনের জন্য অধিক জরুরী। অতএব, বিয়ের পর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াই বর্তমান সময়ের দাবী। পৃথক থেকে আপন উপার্জন হতে সাধ্যমত মা-বাবার খিদমত করে যাবে।

মা-বাবা পৃথক হতে নিষেধ করলে

হযরত থানবী (র) একদিন ওয়াজ করতে গিয়ে বললেন, মা-বাবা থেকে পুত্রবধূ পৃথক থাকতে চাইলে তাকে পৃথক রাখা স্বামীর উপর ওয়াজিব। এটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার। অথচ কুরআনুল কারীমের নির্দেশ হলো– শিরকের নির্দেশ ব্যতীত মা-বাবার যে কোন নির্দেশ পালন করা ফরজ। এমতাবস্থায় মা-বাবা যদি স্ত্রীকে পৃথক রাখতে সম্মত না হয়, আর স্ত্রী যদি পৃথক থাকতে চায়– একই বাড়িতে কিংবা ভিন্ন বাড়িতে। এক্ষেত্রে করণীয় কি? সে কার ইচ্ছা পূরণ করবে? মা-বাবার নাকি স্ত্রীর?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, যেহেতু স্ত্রীকে তার ইচ্ছানুযায়ী পৃথক ঘরে রাখা স্বামীর উপর ওয়াজিব এবং স্বামীর কাছে তার প্রাপ্য অধিকার। সেহেতু উক্ত ওয়াজিব ত্যাগ করে মা-বাবার আনুগত্য হতে পারে না। মা-বাবা এ ওয়াজিব ত্যাগ করার নির্দেশ দিলে তা পালন করা জায়েয হবে না। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।"

স্ত্রী পৃথক থাকার দাবী করলে, তার দাবী পূরণ করা শরয়ী দিক থেকে ওয়াজিব। আর শরীয়তের কোন ওয়াজিব হুকুম লংঘন করা আল্লাহর নাফরমানী। অতএব, মা-বাবা যদি উক্ত নাফরমানীর নির্দেশ দেয়, তাহলে তা পালন করা জায়েয নেই।

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (র)-এর কাছে লিখলো, হযরত! পারিবারিক কলহের কারণে স্ত্রীকে নিয়ে দু'বছর যাবৎ পৃথক ঘরে অবস্থান করছি। পৃথক হওয়ার কারণে খরচ বেড়েছে। আগের মত পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা মা-বাবাকে দিতে পারছি না। ফলে মা-বাবা অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়। পর্যাপ্ত খরচ দিতে না পারার কারণে তাঁরা চান, যেন তাঁদেরকে নিয়ে একসাথে থাকি। আশা করি বিষয়টির যথাযথ সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবে থানবী (র) লিখলেন, যেহেতু স্ত্রীকে মা-বাবা থেকে পৃথক রাখা শরীয়তের নির্দেশ। এটা স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। সেহেতু স্ত্রী তার এ বৈধ অধিকার দাবী করলে তা পূরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। ওয়াজিব ত্যাগ করা আল্লাহর নাফরমানী। আর আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে মা-বাবার আনুগত্য হতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীকে পৃথক রাখাই উচিত।

স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে রাখার শরয়ী হুকুম

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার অনিবার্য প্রয়োজন সমূহের একটি প্রধান অংশ। অনেকে স্ত্রীকে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া নিজের দায়িত্ব মনে করেন না। স্ত্রীকে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের সাথে রাখতেই অধিক পছন্দ করেন। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, স্ত্রী যদি সকলের সাথে থাকতে সম্মত হয়, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তার জন্য থাকার পৃথক ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। সম্মত হওয়ার অর্থ হলো, পূর্ণ আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে রাজী হওয়া। স্বামী যদি সুস্পষ্ট আকার-ইঙ্গিত দ্বারা বুঝতে

পারে যে, স্ত্রী পৃথক থাকতে চায়; কিন্তু মুখে ব্যক্ত করতে পারছে না, তাহলেও তাকে সকলের সঙ্গে একসাথে রাখা জায়েয হবে না।

অনেকে স্ত্রীকে মা-বাবার বাধ্যগত ও অধীনস্ত বানিয়ে রেখে এটাকে নিজের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। ফলে স্ত্রী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। স্মরণ রাখা উচিত, শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। মা-বাবার খিদমতের মাধ্যমে সৌভাগ্য লাভ করতে চাইলে নিজে খিদমত করবে কিংবা খিদমতের জন্য চাকর-চাকরানী নিয়োগ করবে। আমার মতে তো রান্না-বান্না করাও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا ـ

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও।" (সূরা রূম, আয়াত-২১)

সুতরাং স্ত্রী হলো স্বামীর অন্তরের প্রশান্তি ও আনন্দ লাভের জন্য। রান্না-বান্না ও খাবার প্রস্তুত করার জন্য নয়।

স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত তাকে মূল ঘরের একটি কামরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেবে। যেন তাতে সে যে কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, নিজের যাবতীয় আসবাব-পত্র হেফাজত করে রাখতে পারে এবং স্বামীর সাথে স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা, উঠা-বসা ও কথা-বার্তা বলতে পারে। ওয়াজিব আদায় হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। যদি একই ঘরে পৃথক কামরায় থাকে, তাহলেও চুলা অবশ্যই ভিন্ন হওয়া উচিত। কারণ, অধিকাংশ ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত হয় চুলা থেকে।

বিয়ের পর ছেলেকে পৃথক করে না দেয়া অন্যায়

পুত্রবধূ পৃথক থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও তাকে পৃথক থাকার ব্যবস্থা না করে দেয়া তার প্রতি অবিচার করার শামিল। এ ধরনের অবিচার থেকে অনেক দ্বীনদার লোকও মুক্ত নয়। বিশেষত পুরাতন কালের মহিলাগণ এটাকে বরদাশ্‌তই করতে পারে না। তাদের মতে এর ফলে ঘরের বরকত? নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন রকম কাল্পনিক মন্তব্য করে থাকে। স্মরণ রাখা উচিত– আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করে কারো আনুগত্য হতে পারে না।

স্ত্রী পৃথক থাকতে চাইলে তাকে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া স্বামীর দায়িত্ব। কারণ, এটা স্ত্রীর হক। উপরন্তু স্ত্রীকে পৃথক রাখার মধ্যেই শান্তি ও কল্যাণ নিহিত।

যৌথভাবে থাকার ফলে বহু রকমের সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি হয়। পুত্র-বধূদেরকে একান্নভুক্ত পরিবারে রেখে তাদের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালানো আগের কালের মহিলাদের একটি সাধারণ অভ্যাস।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ছেলে যদি স্ত্রীর প্রতি একটু মনোযোগী হয়, তখন পরিবারের সকলে চরম প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। আবার যদি অমনোযোগী হয়, তাহলেও লবণ পড়া, চিনি পড়া এবং বিভিন্ন প্রকারের দোয়া-তাবিজের আশ্রয় নেয়া হয়। সুতরাং পৃথক থাকাই শ্রেয়। পৃথক থাকলে এ জাতীয় সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় না।

যদি বলা হয়, বর্তমান যুগের স্ত্রীরা বুদ্ধির স্বল্পতা ও চিন্তার অপরিপক্কতার কারণে শাশুড়ীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাঁর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় এবং শাশুড়ীকে বিভিন্নভাবে জ্বালাতন করে। এদিক থেকেও তো তাদেরকে পৃথক করে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত। মোটকথা, পৃথক করে দেয়া বউ ও শাশুড়ী উভয়ের জন্যই নিরাপদ ব্যবস্থা।

অনেক স্ত্রী স্বামীর ঘরে এসেই তাকে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এটা যদিও চরম অশোভনীয় এবং যদিও বিয়ের পরপরই মা-বাবা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে সেটা অবশ্যই যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। স্ত্রী এসেই অশোভনীয় পদ্ধতিতে স্বামীকে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কোনই অধিকার তার নেই।

বর্তমান সময় ও বাস্তবতার দাবী এটাই যে, স্ত্রী যদিও যৌথ পরিবারে একসাথে থাকতে সম্মত থাকে এবং পৃথক হওয়ার কারণে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তবুও তাকে পৃথক রাখাই অধিক সঙ্গত। এর দ্বারা বহু সমস্যা ও অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যদিও এর ফলে সাময়িকভাবে আত্মীয়-স্বজন সকলে নাক-মুখ বাঁকা করে বসবে, অসন্তুষ্ট হবে এবং সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেবে। কিন্তু অচিরেই যখন পৃথক হওয়ার সুফল প্রকাশ পেতে থাকবে, তখন সকলেই খুশী হতে বাধ্য হবে। বিশেষত চুলাতো অবশ্য অবশ্যই আলাদা হওয়া উচিত। কেননা পারিবারিক যত সব ঝগড়া-ফাসাদের আগুন অধিকাংশ সময় চুলা থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়।

স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সন্তানগণ

ফিকাহ্শাস্ত্রবিদগণের মতে, স্বামীর প্রথম স্ত্রীর ছেলে-মেয়ে থাকলে তাদের সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীকে থাকতে বাধ্য করা জায়েয নেই।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সতিনের সন্তানদের সাথে থাকার ফলে যে সমস্ত ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে থাকলে হয় না।

হযরত থানবী (র)-এর একটি ঘটনা

হযরত থানবী (র) বলেন, আমার আব্বাজান (র) আমার বিয়ের সাথে সাথেই আমাকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। আমাদের এলাকায় অধিকাংশ পরিবারে এ নিয়ম ছিলো যে, ছেলে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার যাবতীয় খরচ ও বাসস্থানের জায়গাসহ পৃথক করে দিতো। এটা আমার কাছে আত্মমর্যাদাহানিকর মনে হলো। তাই নিজে চাকরি করে উপার্জন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! চাকরি পেয়ে গেলাম। পঁচিশ রুপী বেতন ধার্য হলো। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, পঁচিশ রুপী কি কাজে ব্যয় করবো। আমার তো ধারণা ছিলো, দশ/বিশ রুপীই আমার জন যথেষ্ট। কিছুদিন আমি একাকী থাকলাম। অতঃপর আমাকে কানপুর আসতে হলো। তখন বাস্তব অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম, পঁচিশ রুপী আমার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অধিক নয়। কারণ, সবই খরচ হয়ে যেতো।

ঘরে স্ত্রী আমাকে সর্বদা পৃথক বাসস্থানের জন্য একটি ঘর বানাতে বলতো। আমি তাকে এ বলে বুঝ দিতাম, অস্থায়ী জীবনের জন্য ঘরের আবার কি প্রয়োজন?

আমি যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলাম এবং পরবর্তীতে আমার স্ত্রীও সেখানে গিয়ে পৌছলো, তখন সে সেখানে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কীর কাছে অভিযোগ করলো যে, "আমি সর্বদা আলাদা ঘর বানানোর কথা বলি; অথচ উনি তা করতে রাজী নন।" হযরত আমাকে বললেন– "তোমার স্ত্রী পৃথক ঘর তৈরি করার কথা বলছে। অসুবিধা কি? এটা তো উত্তম ব্যবস্থা। নিজস্ব আলাদা ঘরে থাকলে অনেক আরাম ও শান্তি পাওয়া যায়।" আমি মনে মনে বললাম, চমৎকার! আমার হাতে ঘর বানিয়ে নেয়ার বড় সুন্দর কৌশল সে বের করে নিলো। আমি আরজ করলাম, "হযরত! অনেক সুন্দর ঘর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।" হজ্জ আদায় শেষে দেশে ফিরে আসার পর ঘর তৈরি হয়ে গেলো। আমি হযরতকে এ সংবাদ লিখে জানালাম। তিনি উত্তরে লিখলেন– তোমার ঘর বরকতপূর্ণ হোক। হযরত থানবী (র) বলেন, ঘর তৈরি করে তাতে অবস্থান শুরু করার পর বুঝতে পারলাম, পৃথক ঘর ব্যতীত আরাম ও শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। তবে যদি কেউ অসচ্ছলতার কারণে পৃথক ঘর করতে অসমর্থ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের আসবাব-পত্র পৃথক থাকা আবশ্যক

আরবের প্রথা ছিল– গৃহের যাবতীয় আসবাব-পত্র স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের পৃথক পৃথক থাকবে– স্ত্রীর জিনিসপত্র আলাদা এবং স্বামীর জিনিসপত্র আলাদা। প্রত্যেকে আপন আপন জিনিসপত্রই শুধু ব্যবহার করবে। বর্তমানে ইউরোপে এ প্রথা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। মেম সাহেবের জিনিসপত্র আলাদা এবং সাহেবের জিনিসপত্র আলাদা। গৃহে প্রতিটি বস্তুর মালিকানা সুস্পষ্ট থাকার এ প্রথা– যা আজ ইউরোপে রয়েছে– এক সময় মুসলমানদের মধ্যে ছিল। ভারত বর্ষেও যদি এ প্রথা চালু হয়ে যেতো, তাহলে কতই না ভালো হতো!

বর্তমানে আমাদের সমাজ এমন কলুষিত হয়ে গেছে যে, কেউ কারো হক বা অধিকারের প্রতি সামান্যতম ভ্রূক্ষেপও করে না। অজ্ঞতা ও মূর্খতা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি লেন দেনের স্বচ্ছতা, মালিকানার স্পষ্টতা ও অপরের অধিকার রক্ষা করার আদর্শ– যা আজ ইউরোপে বিরাজ করছে এবং এক সময় যা ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ছিল।

লেন-দেন ও মালিকানার স্বচ্ছতার দাবী হলো– স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের মালিকানাধীন বস্তুসমূহ পৃথক পৃথক থাকবে। অথচ আমাদের সমাজের অবস্থা হলো, পরিবারে কোন্‌টি কার জিনিস তা কারোরই জানা থাকে না। একজনের জিনিসের উপর অপরজনের অন্যায় হস্তক্ষেপ দ্বিধাহীনভাবে চলে।

স্ত্রীর ব্যবহার্য অলঙ্কার সমূহে একথা স্পষ্ট থাকে না যে, কোন্‌টি তার বাবার দেয়া এবং কোন্‌টি স্বামীর দেয়া এবং স্বামীর প্রদত্ত অলংকার কি তাকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে নাকি শুধু ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে। কেউ যদি গৃহে ব্যবহার্য জিনিসপত্রে নিজের ও স্ত্রীর পৃথক পৃথক মালিকানা নির্ধারণ করে নিতে চায়, তাহলে তার উপর নিন্দা ও তিরস্কারের ঝড় বইতে শুরু করে। গোটা সমাজ তার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে যে, "অমুক ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বস্তুসমূহেও কারো হাত স্পর্শ করতে দেয় না। এটাকে চরম সংকীর্ণতা ও কৃপণতা ছাড়া আর কি বলা যায়।" তাদের মতে উদার ও দানশীল হতে হলে সম্পূর্ণ এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল থাকতে হবে। নিজের জিনিস ও অপরের জিনিসের মধ্যে ভেদাভেদ থাকতে পারবে না।

অস্বচ্ছ মু'আমালার পরিণতি

উল্লিখিত তথাকথিত উদারতার অশুভ পরিণতি তখনই প্রকাশ পায়, যখন পরিবারের যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিসপত্র বন্টন করা হয়। তখন কেউ বলে, মৃত ব্যক্তি এটা আমাকে দিয়ে গেছে। কেউ বলে, এটা তার নয়, বরং আমার। স্ত্রী বলে, এ সব জিনিস আমার পিত্রালয় থেকে আনা হয়েছে। ফলে এ বিরোধ নিষ্পত্তির কোন সুযোগ থাকে না। উপরন্তু তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে এমন ঝগড়া-কলহ শুরু হয়ে যায়, যা অন্যদের জন্য রীতিমত হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে কোথাও পরিবার সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হলে সেখানে ঝগড়া-কলহ সুশিক্ষা ও সভ্যতা বিরোধী হওয়ার কারণে তা সৃষ্টি না হলেও আপোষের মধ্যে মনোমালিন্য ও হিংসা-বিদ্বেষ তো অবশ্যই দেখা দেয়। কখনও কখনও তা আদালতে পর্যন্ত গড়ায়। পরিণামে ঘরই জেলখানায় পরিণত হয়। এ তো হলো অস্বচ্ছ মু'আমালার জাগতিক ক্ষতি।

আর পারলৌকিক ক্ষতি তো আরো ভয়াবহ। কেননা, অনুমতি ছাড়া অপরের মালিকানায় হস্তক্ষেপের ফলে গুনাহগার হতে হয়। অপরের জিনিসে হস্তক্ষেপের ফলে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত বস্তুর দাবী থেকে যায়। কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশ বড়ই কঠিন। তিন পয়সার দাবী কারো উপর থেকে গেলে কিয়ামত দিবসে তার সাতশ' মাকবূল নামাজের সাওয়াব উক্ত পয়সার দাবীদারকে দেয়া হবে। গোটা জীবন যা কিছু নামাজ আদায় করা হলো তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া কেমন দুর্ভাগ্যের কথা!

দুনিয়াও বরবাদ হলো এবং পরকালও বরবাদ হলো। দুনিয়াবী বরবাদী তো হলো, পরিবারের মধ্যে সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা অব্যাহত থাকা। আর পরকালীন বরবাদী হলো, গোটা জীবনের নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগীর সাওয়াব হতে বঞ্চিত হওয়া।

মু'আমালায় অস্বচ্ছতার কারণে কখনও কখনও পার্থিব দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এক ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলো। সে আমার কাছে এসে বললো, তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করে দিতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্ত্রীর মালিকানাধীন জিনিসপত্র কি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দানে সে রীতিমত লা-জবাব হয়ে গেলো। কেননা তার খবরই নেই যে, কোন্‌টি তার নিজের এবং কোন্‌টি তার স্ত্রীর। আমি বললাম, তোমার এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, যে সব বস্তুর মালিকানা স্পষ্ট নয়, সেগুলো তোমার স্ত্রীর মনে করবে। মৃতের সকল ওয়ারিসকে একত্রিত করো। প্রত্যেকে আপন আপন

জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার পর যেগুলোর মালিকানা অস্পষ্ট থাকবে, তা ওয়ারিসদের মধ্যে শরীয়ত অনুসারে বন্টন করে দিবে। সে তাই করলো এবং অনেক মুশকিলের সাথে মৃতের রেখে যাওয়া জিনিসপত্রের সমাধান হলো। আর এটা সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে দ্বীনদারী থাকার কারণে। অর্থাৎ, সে দ্বীনদার হওয়ার কারণেই অনেক সমস্যা ও জটিলতা সত্ত্বেও সে মৃতের পরিত্যক্ত জিনিসগুলো শরীয়ত অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা করেছিল।

মোটকথা, ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র একসাথে থাকা এবং কোনটি কারো নামে নির্ধারিত না থাকা বাহ্যত ভালো লাগলেও তার অপরিণামদর্শিতা তখনই প্রকাশ পায়, যখন পরিবারের কোন একজন মৃত্যুবরণ করে। আর এটা এ কারণেই যে, আমাদের লেন-দেন, আদান-প্রদান ও মু'আমালা-মু'আশারা স্বচ্ছ ও শরীয়তসম্মত নয়।

স্বামী স্ত্রীকে ঘরের খরচ বাবদ যা কিছু দেয় সে ক্ষেত্রেও উল্লিখিত অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। স্বামী তার সমস্ত উপার্জন স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে। স্ত্রী নিজেকে তার মালিক মনে করে বসে। ফলে সে তা যথেচ্ছা খরচ ও নিজের ইচ্ছামত দান-খয়রাত করে এবং ইচ্ছামত পিত্রালয়ে পাঠাতে থাকে। কেননা তার বিশ্বাস হলো, সে নিজেই এসব কিছুর মালিক। অপরদিকে স্বামী যখন দেখে, তার কষ্টার্জিত অর্থ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অপচয় করা হচ্ছে এবং এ জন্য স্ত্রীকে প্রশ্ন করে, তখন সে বলে দেয়, এ টাকা-পয়সা তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে। অতএব, আমি যেখানে ইচ্ছা খরচ করবো, যাকে ইচ্ছা তাকে দিবো। স্বামী বলে, আমি তো তোমাকে যথেচ্ছা খরচ করার জন্য দেইনি। এটা তো তোমার কাছে আমানত রেখেছি। মোটকথা, এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়ে যায়। অস্পষ্ট মু'আমালা ও লেন-দেনের কারণেই এ সব সমস্যার সূত্রপাত হয়। এজন্য লেন-দেন ও আদান-প্রদান অবশ্যই স্বচ্ছ থাকা উচিত। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা কিছু অর্পণ করবে, তা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া উচিত যে, তা কোন্ সূত্রে অর্পণ করা হচ্ছে।

অস্বচ্ছ মু'আমালার কারণে যাকাত আদায়ে সমস্যা

স্ত্রীর ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত আদায় করা শরীয়তের নির্দেশ। অস্পষ্ট লেন-দেনের কারণে শরীয়তের এ নির্দেশ পালনে অবহেলার সুযোগ থেকে যায়। স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার তার ব্যক্তিগত কোন কাজে আসে না। সুতরাং যাকাত তার উপর কেন ওয়াজিব হবে? আর স্ত্রী মনে করে, এ স্বর্ণালঙ্কারে আমার পূর্ণ মালিকানা নেই। অতএব, আমার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যাকাত অনাদায়ী থেকে

যায়। অথচ স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী দাবী করে বসে যে, এ স্বর্ণালংকার আমার। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আমাকে এর মালিক বানিয়ে গেছেন।

কি অদ্ভুত ব্যাপার! স্ত্রী যেহেতু জানে, এ অলঙ্কার আজীবন সে-ই ব্যবহার করবে। তাই যাকাতের দায়ভার স্বামীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করার জন্য সে উপস্থিত হয়ে গেলো। মোটকথা, যাকাতের দায়ভার বহন করার জন্য স্বামী আর মালিক বনার জন্য স্ত্রী।

বস্তুতঃ মালিকানা স্পষ্ট না থাকার কারণেই যাকাত আদায়ে এ ফাঁকিবাজির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অলঙ্কার বানানোর পরপরই যদি তার মালিকানা স্পষ্ট করে দেয়া হতো, তাহলে যাকাত আদায়ে সমস্যা কিংবা যাকাত আদায় থেকে বাঁচার এ কৌশল গ্রহণের সুযোগ থাকতো না।

এজন্য লেন-দেন স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীকে অলঙ্কারের মালিক বানিয়ে দেয়া হলে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপর। আর যদি তাকে শুধুমাত্র পরিধানের জন্য দেয়া হয়, তাহলে যাকাত স্বামীকে আদায় করতে হবে। স্ত্রী মালিক হওয়ার কারণে স্ত্রীর উপর অলঙ্কারের যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও স্বামী তার অনুমতি সাপেক্ষে আদায় করে দিলে ভিন্ন কথা।

অলঙ্কারের ব্যাপারে আরেকটি ভ্রান্তি

অলঙ্কারের ব্যাপারে আরেকটি ভ্রান্তি এই যে, স্ত্রীকে হাজার হাজার টাকার অলঙ্কার দেয়া হয়। অথচ একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়না যে, সেটা তার মহরের অন্তর্ভুক্ত কিনা।

ফলে স্ত্রীকে সব কিছু দেয়া সত্ত্বেও তার মহরের একটি পয়সাও আদায় হয় না। স্ত্রীর পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হলো, অথচ তার মহরের দাবী থেকেই গেল। অথচ মহর বান্দার হক। আর বান্দার হক সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য হলো, অপরের তিনটি পয়সার জন্য কিয়ামত দিবসে সাতশ' মাকবূল নামাজের সাওয়াব ছিনিয়ে নেয়া হবে।

কেমন নির্বুদ্ধিতার কথা! স্ত্রীর জন্য তার প্রাপ্য মহরের চেয়ে অধিক অর্থ খরচ করা সত্ত্বেও তার মহরের দাবী স্বামীর উপর পূর্ববৎ অনাদায়ীই থেকে গেলো।

হাঁ! স্ত্রী মারা যাওয়ার পর যখন তার ওয়ারিসগণ মহর পরিশোধের দাবী করে, কিংবা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে নিজেই মহর দাবী করে, তখন স্বামী দাবী করে যে, তাকে প্রদত্ত স্বর্ণালঙ্কারসমূহ মহর বাবদ দেয়া হয়েছে। তার কাছে আমাদের প্রশ্ন তোমার নিয়তের খবর মানুষ না জানলেও আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন। তুমি কি কখনও বলেছিলে যে, অলঙ্কার তুমি মহর বাবদ দিয়েছো?

কেউ কারো কাছে একটি পয়সাও যদি পাওনা থাকে, তাহলে উক্ত দেনাদার পাওনাদারকে লাখ টাকা দান করে দিলেও তার এক পয়সার ঋণ পরিশোধ হবে না। ঋণ পরিশোধ তখনি হবে, যদি সে দেয়ার সময় স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এটা তার ঋণ পরিশোধ বাবদ। যদি অলঙ্কার মহরের অংশ হিসেবে দিতে হয়, তাহলে দেয়ার সময় অবশ্যই সুস্পষ্টরূপে বলে দিতে হবে যে, এটা মহরের অংশ। যেন স্ত্রী তার হিসাব রাখতে পারে। মোটকথা, যে কোন মু'আমালা বা লেন-দেন কোন মতেই অস্পষ্ট থাকা উচিত নয়। কারণ, এটা বান্দার হক বা অধিকারের প্রশ্ন। মহরের একটি পয়সাও অনাদায়ী থেকে গেলে সেই দাবী স্বামীর উপর থেকেই যাবে। এজন্য যে কোন লেন-দেন সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও অনিয়মতান্ত্রিক হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পরিবারের কাউকে কোন কিছু দিতে হলে তার জন্যও ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেমনঃ

এক ঃ যখন অলঙ্কার, খাট, ফার্নিচার বা অন্য যে কোন গৃহ সামগ্রী খরিদ করবে, তখন সাথে সাথে স্পষ্ট করে দিবে যে, এটা কার জন্য খরিদ করা হচ্ছে। তাহলে সেই বস্তুর মালিকানা নিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি হবে না।

দুই ঃ স্ত্রীকে সংসার চালানোর খরচ দেয়ার সময়ও তা সুস্পষ্ট করে দেয়া আবশ্যক। স্ত্রীকে যা কিছু দেয়া হবে, তা খরচ করার খাত নির্ধারণ করে দিবে।

আমার মতে পরিবারের খরচ বাবদ স্ত্রীকে যে টাকা-পয়সা দিবে, তা সম্পর্কে স্পষ্টরূপে বলে দিবে যে, "এটা স্ত্রীর কাছে আমানতস্বরূপ। পারিবারিক প্রয়োজনেই শুধু তা খরচ করার অনুমতি আছে।" তবে ব্যক্তিগত খরচের জন্যও স্ত্রীকে নিয়মিত কিছু টাকা দেয়া উচিত। যা সে নিজ ইচ্ছামত খরচ করবে। ব্যক্তিগত খরচের জন্য তাকে পৃথক কোন টাকা-পয়সা না দিলে স্বভাবতই সে আমানতে খিয়ানত করবে। ব্যক্তিগত খরচের টাকা-পয়সা আলাদা না দিয়ে তার উপর হিসাব-নিকাশে চাপাচাপি করা অন্যায়।

তিন ঃ অলঙ্কার খরিদ করার সময়ও কর্তব্য হলো, স্ত্রীকে স্পষ্টরূপে বলে দেয়া যে, এ অলঙ্কারের মালিক তুমি। যদি তাকে মালিক বানিয়ে দেয়ার ইচ্ছা না থাকে, তাহলেও স্পষ্টরূপে বলে দেয়া যে, এ অলঙ্কারের মালিক তুমি নও। তোমাকে তা শুধু পরিধান করার জন্য দেয়া হচ্ছে।

পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সুখকর হওয়ার জন্য এটাই শরীয়ত নির্দেশিত পদ্ধতি। এতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই দ্বীন রক্ষিত হয়। অথচ আমাদের সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি এমন বিকৃত রূপ লাভ করেছে যে, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক থাকাকে চরম সংকীর্ণতা মনে

করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাদের প্রতি নাক সিটকাতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত থাকে না।

আমার [হযরত থানবী (র)] আল্হামদুলিল্লাহ কোন জিনিসেরই মালিকানা অস্পষ্ট নয়। যেমন ঘরে কয়েকটি চৌকি আছে। তন্মধ্যে একটি আমার। যা জনৈক বন্ধু আমাকে দিয়েছিলো। আমি তা আমার নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি। অবশিষ্ট চৌকিগুলো ঘরের অন্যান্যদের জন্য। এভাবে প্রতিটি জিনিসেরই মালিক নির্ধারিত রয়েছে। এমনকি থালা-বাসনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত। ব্যবহারের সময় একজনেরটি অপরজনের সামনে এসে গেলেও প্রত্যেকেরই জানা থাকে যে, কোনটির মালিক কে।

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত। কার মৃত্যু কখন হবে কেউ বলতে পারে না। ঘরের প্রতিটি জিনিসের মালিকানা সুস্পষ্ট না থাকলে যদি কেউ মারা যায়, তখন তার মালিকানাধীন বস্তুসমূহ চিহ্নিতকরণে বড়ই বিভ্রাট সৃষ্টি হয়।

পরিবারে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম-শৃংখলা থাকা অত্যন্ত জরুরী। এটাকে সংকীর্ণতা ও নীচুতা মনে করার কারণ হলো, সর্ব সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই নিয়মের প্রচলন না থাকা। ফলে দু'একজন তা করতে গেলে সকলে এটাকে নতুন কিছু মনে করে নাক সিটকাতে থাকে। সর্ব সাধারণের মাঝে এর ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেলে তখন আর কারো কাছে নতুন মনে হবে না এবং কেউ খারাপও মনে করবে না। বরং তার উপকারিতা ও সুফল দেখে অন্যরাও তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে।

এক মহিলা আমার ঘরের জন্য একটি হাদিয়া নিয়ে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কাকে দিলে? আমাকে না আমার স্ত্রীকে? তখন সে চিন্তায় পড়ে গেল্লো কি জবাব দিবে? সে তো প্রথানুযায়ী হাদিয়াটি নিয়ে এসেছে, যা আমার ঘরে কাজে লাগবে। তার মালিক কে হবে, এটাতো সে চিন্তা করেনি। পূর্ব থেকে যখন সে এমন কোন চিন্তা করেনি, তখন হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে কিভাবে? পরিশেষে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, আমি তা আপনাদের উভয়জনকেই দিলাম। আমি বললাম, বেশ ভালো, তোমার হাদিয়াটি আমাদের উভয়ের।

স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের মালিকানা যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন। তাই অনুমতি ছাড়া একজনের জিনিস অপরজন ব্যবহার করা জায়েয নেই। অর্থাৎ, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার কোন বস্তু যেমন স্বামীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। তেমনি স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোন বস্তু স্ত্রীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। অনুমতি বা সম্মতির অর্থ হলো, সুস্পষ্ট আলামত ও নিদর্শন দ্বারা মালিকের সম্মতি

সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া। আর সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতির অর্থ হলো, অনুমতি না দেয়ারও পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা।

অনুমতি ছাড়া স্বামীর টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা

অনেক নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার অগোচরে তার টাকা পয়সা জমা করে বাপের বাড়ি পূর্ণ করে। মা-বাবাকে দেয়ার জন্য সুযোগের তালাশে থাকে। এটা জঘন্য অন্যায়। স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের কোনই অধিকার নেই। স্বামীর কোন কিছু কাউকে দিতে হলে, অবশ্যই স্বামীর অনুমতিক্রমে হতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে যে সব জিনিসের মালিক বানিয়ে দিবে, তা থেকে অবশ্য সে যা ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা স্বামীর অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে।

কিন্তু স্ত্রীকে যে সমস্ত জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়নি; বরং সংসার খরচের জন্য দেয়া হয়েছে, তা স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন খাতে খরচ করা কিছুতেই জায়েয হবে না। এমনকি ভিক্ষুককে দান করাও জায়েয নেই।

কাউকে কিছু দান বা সদকা করা জায়েয হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, উক্ত দান ও সদকা শরীয়তসম্মত হওয়া এবং শরীয়তের খেলাফ না হওয়া। যেমন, স্ত্রীর কাছে স্বামীর টাকা জমা আছে, উক্ত টাকা থেকে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে দান করলে জায়েয হবে না। বরং গুনাহ হবে। যদিও এটা স্ত্রীর দৃষ্টিতে বড় সাওয়াবের কাজ। কারণ, এ টাকার মালিক সে নয় ; বরং তার স্বামী। স্বামী তাকে তা দান করার অনুমতি দেয়নি। কিংবা অনুমতি চাওয়ার পর অসন্তুষ্টির সাথে অনুমতি দিয়েছে অথবা ইংগীত ও নিদর্শন দ্বারা স্বামীর সম্মতি বা অসম্মতি কোনটিই বুঝা যায়নি। এজন্য উক্ত দান শরীয়ত বিরোধী হলো। আর শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে সাওয়াবের আশা করা যায় না। বাহ্যিকভাবে এটাকে বড় মহৎ কাজ মনে হলেও (কেননা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করতে গিয়ে নিজে গুনাহগার হওয়ার প্রতি পর্যন্ত লক্ষ্য করলো না) মহান আল্লাহর কাছে তা কিছুতেই মহৎ কাজ নয়। এরূপ দান তাঁর কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

স্বামীই আগে মারা যাবে এ আশংকায় অনেক নারী স্বামীর অগোচরে তার টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে থাকে। যেন স্বামীর মৃত্যুর পর সে উক্ত টাকা খরচ করতে পারে। যেমন, স্বামী মাসিক খরচের জন্য স্ত্রীকে চল্লিশ টাকা দেয়। সে উক্ত টাকা হতে কুড়ি টাকা খরচ করে এবং কুড়ি টাকা জমা রেখে দেয়। এভাবে তার কাছে বিরাট অঙ্কের টাকা জমা হয়ে যায়। অতঃপর স্বামী দুর্ঘটনাক্রমে প্রথমে মারা গেলে উক্ত টাকা তার কাছে থেকে যায়, যা সম্পর্কে কারোরই জানা থাকে না। মনে রাখা উচিত, এভাবে স্বামীর অগোচরে তার প্রদত্ত টাকা জমা করা জায়েয নেই। এ টাকার মালিক মৃতের উত্তরাধিকারী সকলে।

কিছু জমা করতে হলে অবশ্যই তা স্বামীর অনুমতিক্রমে এবং মৃত্যুর পূর্বে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তার থেকে জমাকৃত সমুদয় টাকার দাবী মুক্ত করে নিতে হবে। স্ত্রী তখনই কেবল জমাকৃত টাকার মালিকানা দাবী করতে পারবে। অন্যথায় উক্ত টাকার মালিক মৃতের সমস্ত ওয়ারিসগণ। এককভাবে তা ভোগ করার অধিকার তার নেই।

স্বামীর মাল খরচ করার সীমারেখা

মহিলারা অনেক সময় পূর্বানুমতি ছাড়াই স্বামীর মাল নির্দ্বিধায় খরচ করতে থাকে এবং মনে করে যে, স্বামী অনুমতি দিয়ে দিবে। অথচ স্বামী কোন কোন সময় এ ব্যাপারে নিরব থাকলেও অনেক সময় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। ফলে উভয়ের মাঝে তিক্ততা ও ঝগড়া-কলহ শুরু হয়ে যায়। এজন্য স্বামীর পক্ষ হতে যে পর্যন্ত সুস্পষ্ট অনুমতি বা অনুমতির প্রবল ধারণা না পাওয়া যাবে, তার মাল হতে খরচ করা বা কাউকে দান করা জায়েয হবে না।

তবে অতি নগণ্য কোন বস্তু হলে– যা সম্পর্কে স্বামীর পক্ষ হতে অনুমতি থাকার প্রবল ধারণা করা যায়-সে ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েয। তবে তাও শুধু কোন নিঃস্ব-দরিদ্র ও ভিক্ষুককে দান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন কোন ভিক্ষুক বা ক্ষুধার্তকে দু'একটি রুটি বা দু'এক মুষ্টি খাবার দেয়া।

স্বামীর অতি নগণ্য কোন জিনিস দেয়া সম্পর্কেই যখন এতটুকু সতর্কতা এবং তার পক্ষ হতে অনুমতির শর্তারোপ করা হয়েছে, তাহলে মা-বাবাকে স্বামীর টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র দেয়ার বৈধতা কিভাবে হয়? তাঁদেরকে তো আর নগণ্য কোন জিনিস দেয়া হয় না। দু'একটি রুটি কি তাদেরকে কেউ দিতে যায়? তাদেরকে দেয়া হয় নগদ টাকা-পয়সা ও জোড়ায়-জোড়ায় কাপড়-চোপড়। যা সম্পর্কে প্রবল ধারণা এটাই যে, স্বামী জানতে পারলে কিছুতেই সম্মতি দিবে না। এজন্যই দেখা যায়, মহিলারা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনকে দেয়ার সময় কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে, যেন স্বামী-কিছুতেই তা জানতে না পারে। কেমন দুঃখজনক কথা! বেচারা স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করলো, আর স্ত্রী তা অন্যদের পেছনে খরচ করে ফেললো।

স্ত্রীর নিজস্ব মাল হলে তা কাউকে দেয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি আবশ্যক না হলেও তার সাথে পরামর্শ করা অবশ্যই জরুরী। ইমাম নাসাঈ (র) সূত্রে বর্ণিত, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَايَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِىْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا –

"কোন নারীর জন্য তার বিয়ের পর স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজের মাল হতে কাউকে দান করা জায়েয নেই।"

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুহাদ্দিস "مَالِهَا" এর অর্থ বলেছেন স্বামীর মাল। স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে স্বামীর মালকে স্ত্রীর মাল রূপে অভিহিত করা হয়েছে। তবে হাদীসটিকে নিম্নোক্ত অর্থে গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

অর্থাৎ, নারী জাতি যেহেতু জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অপরিপক্ব। নিজ সম্পদের উপর তাদেরকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হলে জ্ঞানের স্বল্পতা ও বুদ্ধির অপরিপক্কতার কারণে তা অপাত্রে খরচ করে নষ্ট করে ফেলার সমূহ আশংকা রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরিপক্ব বুদ্ধিসম্পন্ন নারীদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন স্বামীর সাথে পরামর্শ না করে নিজেদের মাল খরচ না করে।

স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নেয়ার আরেকটি বড় কল্যাণ এই যে, এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হবে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। সে চিন্তা করবে, তার প্রতি স্ত্রীর এতটুকু গভীর সম্পর্ক যে, নিজস্ব সম্পদের ক্ষেত্রেও সে তার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কিছু করে না।

স্ত্রী যদি তার নিজস্ব টাকা-পয়সা আলাদা করে রেখে নিজ ইচ্ছানুযায়ী খরচ করতে থাকে, তাহলে স্বভাবতই পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা ও দূরত্ব সৃষ্টি হবে। এজন্য আমার (হযরত থানবী রঃ) মতে উপরোক্ত হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। হাদীসের "مَالِهَا" শব্দ দ্বারা স্বামীর মাল উদ্দেশ্য করা নিষ্প্রয়োজন। আল্লামা সিন্দী (র)-এর বক্তব্য থেকেও হাদীসের বাহ্যিক অর্থটিই ফুটে উঠে।

অতএব, স্ত্রী তার নিজস্ব মাল খরচ করতে চাইলেও যখন স্বামীর সাথে পরামর্শ করা আবশ্যক। তাহলে মাল যদি নিজের না হয়ে স্বামীর হয়, সে ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়?

চতুর্থ অধ্যায়
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা প্রকৃতিগত। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে : هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ অর্থাৎ, "নারী জাতি তোমাদের জন্য দেহাবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য দেহাবরণ।"

আল্লাহ তা'আলা নারীকে দেহাবরণের সাথে তুলনা করে মূলতঃ নারী-পুরুষের গভীর সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন, যার চেয়ে সুদৃঢ় কোন সম্পর্ক পৃথিবীতে নেই। কেননা স্বামী-স্ত্রী একজনের উপর অপরজনের যে অধিকার রয়েছে উভয়ের মাঝে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ব্যতীত তা আদায় হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর উল্লিখিত অধিকার আদায় সহজসাধ্য হওয়ার জন্যই আল্লাহ পরস্পরের মাঝে এমন সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। যেন দুজনে মিলে একটি সত্ত্বা তথা দু'টি দেহ একটি প্রাণ।

মোটকথা, আয়াতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেহাবরণের সাথে তুলনা করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী একজনের উপর অপরজনের যে অধিকার শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা পূরণ করা অসাধ্য কিছু নয়। কারণ, উভয়ের মাঝে তিনি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন।

আয়াত থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারসমূহ আদায় করা প্রত্যেকের উপর অত্যন্ত জরুরী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিষয়টির প্রতি এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তা আদায় করা সহজসাধ্য হওয়ার জন্য তিনি এমন এক পদ্ধতি বলে দিলেন, যা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত ছিলো। অতএব, আল্লাহ যে বিষয়ের প্রতি এরূপ গুরুত্বারোপ করলেন তা আদায়ে যত্নবান হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

স্বামী ও স্ত্রীকে দেহাবরণ বা পোশাকের সাথে তুলনা করার আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে যে, পোশাকের মধ্যে যেমন দৃষ্টিকটু স্থান ঢেকে রাখার ভূমিকা রয়েছে, অনুরূপ স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর জন্য দেহাবরণতুল্য। অর্থাৎ, প্রত্যেকে অপরজনের দোষত্রুটি গোপনকারী। পোশাক যেমন পরিধানকারীর জন্য শোভাবর্ধনকারী, তেমনি স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভাবর্ধনকারী।

পোশাক তা পরিধানকারীর শোভা বৃদ্ধি করে একথা কুরআনের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ" এখানে "زينة" দ্বারা মুফাস্সিরগণের সর্বসম্মতিক্রমে পোশাক উদ্দেশ্য। কেননা পূর্বের আয়াত থেকে পোশাকের আলোচনা চলে আসছে। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে-

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا -

এ আয়াতে পোশাককে যদিও "زِيْنَةً" (শোভা) অভিহিত করা হয়নি। কিন্তু "زِيْنَةً" (শোভা)-এর যে উদ্দেশ্য, তা এখানেও উল্লিখিত হয়েছে। কারণ, আয়াতে বলা হয়েছে- يُوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের দৃষ্টিকটু স্থানসমূহ আবৃত করে রাখবে। আর زِيْنَةً-এর উদ্দেশ্যও হলো, দৃষ্টিকটু স্থান ও দোষ-ত্রুটিসমূহ আবৃত রাখা। رِيْشٌ -এর অর্থ পাখির পালক, যা পাখির শোভা বর্ধন করে।

মোটকথা, পোশাক যেমন তা পরিধানকারীর জন্য শোভাবর্ধনকারী, তেমনি স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভাবর্ধনকারী। স্ত্রী দ্বারা স্বামীর শোভা বর্ধন এভাবে হয় যে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী পুরুষ সমাজে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। আর স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর শোভাবর্ধন এভাবে হয় যে, তার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ বা অপবাদ আরোপের সুযোগ মানুষের থাকে না। তার আত্মসম্ভ্রম ও সতীত্ব সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। অথচ বিয়ের পূর্বে তার সতীত্ব প্রতিমুহূর্ত আশংকার মধ্যে থাকে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মুখাপেক্ষী

স্বামী ও স্ত্রী একজনকে অপরজনের জন্য পোশাকের সাথে তুলনা করার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, পোশাক পরিধান করা ব্যতীত যেমন মানুষ শান্তি ও স্বস্তি পায় না। তেমনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত কোন পুরুষ ও নারী কখনও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না।

বিবাহ শুধু যৌনক্ষুধা নিবারণ ও কাম-চাহিদা পূরণ করার জন্যই নয়। বরং জীবনের বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি মুখাপেক্ষী। স্ত্রী ব্যতীত কোন পুরুষ পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না।

স্বামী যখন অসুস্থ হয়ে রোগশয্যায় শায়িত হয়, তখন তার খিদমত ও সেবাযত্ন স্ত্রীর চেয়ে অধিক কেউ করে না। জনৈক ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে দ্বিতীয় বিবাহ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। তখন তার পুত্রবধূ ও কন্যা সকলে তাকে বাধা দিয়ে বললো, আপনার খিদমত ও সেবা যত্নের জন্য

তো আমরাই যথেষ্ট, বিবাহ করার কি প্রয়োজন? কিন্তু বৃদ্ধ বললো, স্ত্রীর দ্বারা যে খিদমত ও সেবা যত্ন হয়, তা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যথা সময়ে আমি তা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো। অতঃপর সে সকলের বাধা উপেক্ষা করে বিবাহ করলো। কয়েক বছর পর সে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গেলো। তার পাতলা পায়খানা শুরু হলো। ফলে তার পুত্রবধূ ও কন্যাগণ সকলে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য তার থেকে দূরে সরে গেল। পক্ষান্তরে তার স্ত্রী দূরে সরে যাবে তো দূরের কথা; বরং তাকে দু'পায়ের উপর বসিয়ে পায়খানা করাতো, নিজ হাতে তাকে পরিষ্কার করাতো, পেশাব পায়খানাযুক্ত কাপড়-চোপড় নিজ হাতে ধৌত করতো। দৈনিক সে ২০/২৫ বার পায়খানা করতো। প্রতিবারই স্ত্রী তাকে নিজ হাতে পরিষ্কার করে শোয়াতো। তখন বৃদ্ধ পুত্রবধূ ও কন্যাদেরকে ডেকে বললো, আজকের এদিনের জন্যই আমি বিবাহ করেছিলাম। দেখে নাও আজ আমার এ অসহায় অবস্থায় একমাত্র স্ত্রীই আমার উপকারে এসেছে।

সুতরাং পোশাকের প্রতি মানুষ যেমন মুখাপেক্ষী। তেমনি পুরুষ নারীর প্রতি এবং নারী পুরুষের প্রতি মুখাপেক্ষী। পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের সাহায্যকারী।

স্বামী-স্ত্রী একজনকে অপরজনের জন্য পোশাকের সাথে তুলনা করার আরেকটি কারণ হলো, পোশাক যেমন পরিধানকারীর অনুগামী তেমনি স্ত্রী স্বামীর অনুগামী।

অতঃপর কুরআনের আয়াত– هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ এর মধ্যে নারীদেরকে প্রথমে পোশাকের সাথে তুলনা করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অনুগামী হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী অগ্রগামী হবে। অর্থাৎ, স্ত্রী প্রথম স্বামীকে অনুসরণ করবে।

প্রশ্ন হতে পারে, আয়াতে তো পুরুষদেরকেও নারীদের জন্য পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাহলে পুরুষরাও কি নারীদের অনুগামী হবে? বস্তুতঃ এক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষরাও নারীদের অনুগামী। তবে তাদের অনুগামী হওয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে। অর্থাৎ, নারীরা সৃষ্টিগত ও নীতিগতভাবেই পুরুষদের অনুগামী হবে, পুরুষদের আনুগত্য করবে। কেননা বুদ্ধি ও চিন্তায় নারীরা অসম্পূর্ণ। আর পুরুষ স্ত্রীর অনুগামী হবে তখন, যখন স্ত্রী তার প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত ও ভালোবাসার মাধ্যমে তার হৃদয়-রাজ্য জয় করে নেবে।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের স্তর

স্ত্রী নিঃসন্দেহে স্বামীর শাসনাধীনে স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে চলবে। তবে এমন শাসনাধীন নয়, যেমন দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানী হয়ে থাকে; বরং

স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক হবে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক। আর যেখানে প্রেম ভালোবাসা থাকবে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের মান-অভিমান থাকা স্বাভাবিক। এজন্যই স্ত্রীর উপর স্বামীর সেই শাসন কর্তৃত্ব থাকেনা, যা দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর উপর প্রয়োগ করা হয়। অনেক পুরুষ স্ত্রীর উপর দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর ন্যায় কর্তৃত্ব করতে চায়। ফলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে চিড় ধরতে থাকে। এটা চরম নির্দয়তা ছাড়া কিছুই নয়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এ জাতীয় আচরণ হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তো এমন এক নিবিড় ও পবিত্রতম সম্পর্ক, যে সম্পর্কের সুবাদে খোদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর মহীয়সী স্ত্রীগণ বিভিন্ন সময় মান-অভিমান করতেন, সমকক্ষ ও বন্ধু-বান্ধব সুলভ আচরণ করতেন। অথচ তাঁর সমতুল্য কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই। সকল পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সাথে সাথে তিনি ছিলেন তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি। সম্রাটসুলভ ক্ষমতা ও প্রভাব তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। সমকালীন বিশ্বের সমস্ত সম্রাট তাঁর নাম শুনে কেঁপে উঠতো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি কখনও স্ত্রীগণের উপর ক্ষমতা ও প্রভাব খাটাতেন না। বরং তাঁদের সাথে এমন ব্যবহার ও আচরণ করতেন, যার মধ্যে তাঁর সম্রাটসুলভ ও বন্ধুত্বসুলভ উভয় আচরণই রক্ষা পেতো।

তাঁর সম্রাটসুলভ প্রভাব এ পর্যায়ের ছিলো যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন একটি নির্দেশ অমান্য করার সাহস তাঁরা পেতেন না। তাঁর প্রতি তাঁদের অন্তরে যে সম্মান ও মর্যাদাবোধ ছিলো, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। আবার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কও এ পর্যায়ের ছিলো যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) অনেক সময় তাঁর সাথে বিভিন্ন রকম মান-অভিমান করে বসতেন। তাতে তিনি সামান্যতম অসন্তুষ্টও হতেন না।

স্ত্রী স্বামীর সমকক্ষ নয়

হে নারীগণ! তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে স্বামীর সমকক্ষ মনে করো? তোমরা তো সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়েই পুরুষদের চেয়ে পশ্চাতবর্তী। দেখো, তোমাদের ইমামাত জায়েয নেই। উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য প্রদান, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমরা পুরুষদের পেছনে। সুতরাং কেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করতে চাও?

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, নামাজের কাতারে নারী যদি পুরুষের সাথে পাশাপাশি দাঁড়ায়, তাহলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রেই যখন নারী পুরুষের সমতুল্য নয় (যেমন ঋতুস্রাবের নির্দিষ্ট দিনসমূহে

মহিলাদের নামাজ শরীয়ত মাফ করে দিয়েছে, তাদের উপর ঐ সময় রোজা ফরজ নয়) অথচ উক্ত ইবাদতসমূহের জন্য অতিরিক্ত কোন দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। তাহলে যে সমস্ত বিষয়ে অতিরিক্ত সাহস-মনোবল, শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন– যা একমাত্র পুরুষদের মধ্যেই বিদ্যমান– সে সকল ক্ষেত্রে নারী কি করে পুরুষের সমতুল্য হতে পারে?

নারী ও পুরুষের এ পার্থক্য সৃষ্টিগত। সুতরাং নারীদেরকে পুরুষের সমতুল্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে নারীরা অপরিপক্ব। সাহস-মনোবল ও ধৈর্যক্ষমতা তাদের কম। দৈহিক শক্তিতেও তারা পুরুষদের তুলনায় পেছনে। এজন্যই পুরুষদের তুলনায় তারা অধিক তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা যখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে পুরুষদের চেয়ে পেছনে রেখেছেন, তাহলে কেন তোমরা পুরুষদের সমতুল্য হওয়ার দাবী করছো?

নারী-পুরুষের এ পার্থক্য পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ, "পুরুষদের মর্যাদা নারীদের উপরে।" অতঃপর ইরশাদ হয়েছে– وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ, নারীর উপর পুরুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রদানে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ, এটা আল্লাহ প্রদত্ত, যিনি মহা পরাক্রমশালী, যার হুকুম লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই। আবার এ হুকুম শুধু শাসকসুলভই নয়। কেননা তিনি মহা প্রজ্ঞার অধিকারীও। তাঁর কোন হুকুমই হিকমত ও প্রজ্ঞা মুক্ত নয়। সুতরাং তাঁর কোন হুকুমেই প্রশ্নের অবকাশ নেই।

সৃষ্টিগত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যেও পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সাহস-ধৈর্য, বীরত্ব, দৈহিক শক্তি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মহান আল্লাহ নিজেই পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একজন নারী যতবড় রাজ বংশীয় কিংবা সুদর্শনা ও রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হোক না কেন, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহে সে কখনও একজন পুরুষের সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ, "পুরুষদের মর্যাদা নারীদের উপরে।"

পুরুষ শাসক ও নারী শাসিত

পুরুষের তুলনায় নারীর জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি অপরিপক্ক। আর যার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি অপরিপক্ক, তার প্রতিটি কাজে ভুল হওয়ার আশংকা থাকে। অতএব, নারীর জন্য এটাই নিরাপদ যে, সে অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন পুরুষের অনুগত থাকবে, তার শাসন-কর্তৃত্ব মেনে চলবে।

এজন্যই আল্লাহ পুরুষকে নারীর শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ (পুরুষরা নারীদের শাসক।) সুতরাং নারীগণ তাদের সমস্ত কাজ পুরুষদের তত্ত্বাবধানে করবে, সকল বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে। তাহলে যে কোন ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে।

নারীকে পুরুষের শাসনাধীন করার অর্থ এই নয় যে, তাকে পুরুষের দুর্ব্যবহার ও দুঃশাসনের শিকার বানানো হয়েছে কিংবা তাকে পুরুষের কৃতদাসী বানানো হয়েছে। বরং এ প্রক্রিয়াতেই তার প্রতি ইনসাফ ও দয়া প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন অপরিপক্ব একটি শিশুকে মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে না দিয়ে তাকে কারো অধীন করে দেওয়াই শিশুটির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ। তদ্রূপ অপরিপক্ক নারী জাতিকে মহান আল্লাহ মুক্ত স্বাধীন ছেড়ে না দিয়ে পুরুষদের অধীন করে দিয়েছেন। অন্যথায় তারা যে কাজই করতো সে কাজেই সমস্যা সৃষ্টি হতো। দ্বীনী ও দুনিয়াবী প্রতিটি কাজেই তারা ভুল করতে থাকতো। আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে পুরুষদের শাসনাধীন করে তাদের প্রতি জুলুম নয়, অনুগ্রহ করেছেন। কেননা অপরের অধীনে থাকার মধ্যেই অধিক নিরাপত্তা নিহিত। স্বামী ও স্ত্রী একজন অপরজনের সমকক্ষ হলে পারিবারিক শান্তি শৃংখলা কখনো অটুট থাকতে পারে না। বরং এর ফলে পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত হয়।

স্বামীর অধীন হয়ে থাকার মধ্যেই স্ত্রীর অধিক নিরাপত্তা নিহিত। স্বাধীনতা বড়ই বিপদজনক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْيُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ –

"তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদেরকে মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে।" অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল তোমাদের আনুগত্য করবেন না। বরং তোমাদেরকেই তাঁর আনুগত্য করতে হবে। যদি তিনি তোমাদের আনুগত্য করতেন, তাহলে তা তোমাদেরই জন্য বিপদের কারণ হবে।

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অনুগত বা অনুগামী হওয়ার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত। ছোট বড়কে আনুগত্য করবে, অল্প বুদ্ধি ও অল্প চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অধিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির আনুগত্য করবে, এটাই বিবেক ও বাস্তবতার দাবী।

আয়াতে একথা বলা হয়নি, যদি আল্লাহর রাসূল তোমাদের আনুগত্য করতেন, তাহলে কষ্টে নিপতিত হতেন। বরং বলা হয়েছে, তিনি তোমাদের

আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই বিপদে পড়তে। অতএব, বড়র আনুগত্য করার মধ্যে ছোটরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হে নারীগণ! তোমরা যদি পুরুষদের আনুগত্য করে চলো, তাহলে তোমরা নিজেরাই শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকতে পারবে। তোমরা নিজেদেরকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মুক্ত-স্বাধীন না করে পুরুষদের অধীন করে দিয়েছেন। অন্যথায় তোমাদের জন্য বড়ই বিপদ হতো।

কারণ, প্রথমতঃ নারীরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিতে অপরিপক্ক। দ্বিতীয়তঃ তাদের মধ্যে জেদ ও হটকারিতা অতিমাত্রায় বিদ্যমান। যে কাজের জন্য বেঁকে বসে, তা করেই ছাড়ে। ফলে দুই কারণে তাদের বিপদে পড়ার আশংকা থাকে।

এক. বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির অপরিপক্কতাহেতু চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে না।

দুই. মাত্রাতিরিক্ত জেদ ও হটকারিতার কারণে যা করার জন্য বেঁকে বসে, তা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় না। যদিও স্পষ্টরূপে বুঝতে পারে যে, এ কাজ তার জন্য ক্ষতিকর।

অতি নগণ্য ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও তাদের মধ্যে ক্রোধ ও উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠে। এর একমাত্র কারণ তাদের বুদ্ধির স্বল্পতা ও স্বভাবের বক্রতা। অতএব, তাদেরকে পুরুষের অনুগত ও নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে দেয়ার মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা ও শান্তি। পুরুষ প্রতি মুহূর্ত তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

স্বামী-স্ত্রীর একতা অটুট থাকার উপায়

মনে রাখতে হবে, দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে শান্তি শৃংখলা অটুট থাকার পূর্বশর্ত হলো, একজন অনুসরণকারী এবং অপরজন অনুসৃত হওয়া। মানুষ আজ ইত্তেহাদ ও ঐক্যের লম্বা লম্বা বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন পথ ও পন্থা পেশ করে থাকে। কিন্তু ঐক্যের মূল ভিত্তি কি, তা চিন্তা করে দেখে না।

ঐক্যের মূল ভিত্তি হলো, একজনকে অনুকরণীয় নেতা হিসেবে গ্রহণ করে সকলে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া। যে সমাজে অনুকরণীয় ও অনুসরণকারী থাকবে না ; বরং সকলেই নিজেকে অপরের সমকক্ষ মনে করে অনুসরণীয় হওয়ার দাবী করবে, সে সমাজে কখনো ঐক্য, শান্তি ও শৃংখলা থাকতে পারে না। অতএব, নারীদের উচিত সমকক্ষতার দাবী সম্পূর্ণরূপে অন্তর থেকে মুছে ফেলা। কারণ, এটাই সমস্ত অশান্তি ও বিশৃংখলার উৎস।

নারীরা শাসক (অনুসৃত) হয়ে থাকবে নাকি শাসিত (অনুকরণকারী) হয়ে থাকবে, এ ফয়সালার দায়িত্বভার তাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হলো। ন্যায় ও ইনসাফের সাথে তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, শাসক ও অনুকরণীয় হওয়ার অধিক উপযুক্ত কি তারা না পুরুষরা? একজন সুস্থজ্ঞান সম্পন্ন নারী কখনো একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে পুরুষরাই অগ্রগামী। পুরুষরাই পারে নারীকে সম্পূর্ণ হেফাজত ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে। অতএব, পুরুষই শাসক ও অনুকরণীয় হওয়ার অধিক উপযোগী। নারীরা তার অধীনতা স্বীকার করে চলবে। এটাই মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল।"

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসা

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

আমার মতে ভালোবাসার সময় হলো যৌবনকাল। এ সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে দৈহিক শক্তি বিদ্যমান থাকে। একজনের প্রতি অপরজনের পরিপূর্ণ আকর্ষণ থাকে। আর অনুগ্রহ ও সহানুভূতির সময় হলো উভয়ে যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়। বাস্তবে দেখা যায়, স্বামী যখন বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন একমাত্র স্ত্রীই তার সকল প্রকার সেবাযত্ন ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালোবাসা থাকলেও তা প্রকাশ করা স্বামীর জন্যই শোভনীয়, স্ত্রীর জন্য নয়। অনেকে স্ত্রীর ব্যাপারে সংশয়ে ভুগতে থাকে যে, সে তো স্ত্রীর প্রতি তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা প্রকাশ করে ; কিন্তু স্ত্রী তা করে না।

এর কারণ হলো, পুরুষের জন্য স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা শোভনীয়। কিন্তু স্ত্রীর জন্য তা শোভনীয় নয়। কারণ, লজ্জা ও আত্মসম্ভ্রম নারীর ভূষণ। যা স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশে অন্তরায় হয়। যদিও তার অন্তরে ভালোবাসার সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই বিরাজ করতে থাকে, যা স্বামী রাত-দিন সদা সর্বদা প্রত্যক্ষ করে।

মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা শুধু কেবল শাসক-শাসিতেরই নয়। বরং শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সাথে সাথে উভয়ের মাঝে প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্কও রয়েছে। এজন্য উভয় সম্পর্কেরই দাবী পূরণ করা আবশ্যক। প্রয়োজনবশতঃ স্ত্রীকে ধমক দেয়া, শাসন করা কোন দূষণীয় নয় ; বরং এটাই যথার্থ। শাসক শাসকের ভূমিকায় এবং শাসিত

শাসিতের ভূমিকায় থাকাই যুক্তির দাবী। কিন্তু শাসন করতে গিয়ে তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নয়। শাসনের আড়ালে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালানোকেও শরীয়ত কিছুতেই অনুমোদন করে না। শাসিতের দায়িত্বে যেমন শাসকের কিছু অধিকার বা দাবী রয়েছে, তেমনি শাসকের দায়িত্বেও শাসিতের কিছু অধিকার বা দাবী রয়েছে। প্রত্যেকে আপন আপন দায়িত্ব ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ বজায় রাখা উচিত।

মোটকথা, সবকিছুরই একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করতে গিয়ে তাকে দুর্বল ও অসহায় মনে করে তার প্রতি অবিচার করা কখনও বৈধ হতে পারে না। বাদশা তার প্রজা সাধারণকে শাসন করবে ভালো কথা। কিন্তু শাসনের সুযোগে তাদের প্রতি জুলুম ও অবিচার করা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এখানে তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নয়। বরং উভয়ের মাঝে আরেকটি পূত-পবিত্র সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক। অতএব, উভয় সম্পর্কের দাবীই পূরণ করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
স্বামীর অধিকার

মহান আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি বিরাট অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ এবং তাকে অসন্তুষ্ট করা চরম গুনাহের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থসমূহে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে।

হাদীস-১

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা আদায় করবে, নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত- পৃঃ ২০১)

হাদীস-২

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। (তিরমিযী)

হাদীস-৩

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে যেন স্বামীকে সিজদা করে। আর স্বামী যদি স্ত্রীকে এই পাহাড়ের পাথরসমূহ ঐ পাহাড়ে এবং ঐ পাহাড়ের পাথরসমূহ এই পাহাড়ে বহন করে নিয়ে আসার হুকুম করে, তাহলে তা পালন করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (মিশকাত- পৃঃ ২৮১)

হাদীস-৪

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন কাজের জন্য ডাকে তখন তার ডাকে সাড়া দেয়া তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও সে চুলার উপর থাকে। অর্থাৎ স্ত্রী যত জরুরী কাজেই থাকুক না কেন, স্বামী ডাকামাত্র সবকিছু ত্যাগ করে তার ডাকে সাড়া দেয়া জরুরী।

হাদীস-৫

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যদি স্বামী স্ত্রীকে তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও সে তার আহ্বানে সাড়া না

দেয় এবং এ অবস্থায় স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে উক্ত স্ত্রীর প্রতি ফেরেস্তাগণ ভোর পর্যন্ত লা'নত করতে থাকেন।

হাদীস–৬

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন স্ত্রী যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে উক্ত স্বামীর জন্য নির্ধারিত হুর বলতে থাকে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিওনা, সে তো তোমার কাছে অস্থায়ী মেহ্মান। অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমার সান্নিধ্যে চলে আসবে।

হাদীস–৭

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তিন ব্যক্তি এমন আছে, যাদের নামাজ ও অন্যান্য কোন ইবাদত কবূল হবে না।

এক. এমন ক্রীতদাস যে তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেলো।

দুই. এমন নারী যার প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট।

তিন. এমন ব্যক্তি যে মদ পানে মত্ত থাকে।

হাদীস–৮

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম নারী কে? উত্তরে তিনি বললেন! ঐ নারী যে তার স্বামীকে আনন্দ দেয়, যখন সে তার দিকে তাকায়। স্বামীর কথা মান্য করে এবং তার জীবন ও সম্পদের ক্ষেত্রে এমন কিছু করে না, যা সে অপছন্দ করে।

স্বামীর মর্যাদা

হে নারীগণ! তোমরা পুরুষদের সামনে এত ছোট যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ অনুযায়ী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে, স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি থাকতো। স্ত্রীর উপর স্বামীর কেমন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয হলে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সিজদা করা জায়েয হতো। অথচ আজ নারীগণ স্বামীর এ মর্যাদা রক্ষা করবে তো দূরের কথা, বরং তাকে সমকক্ষ মনে করে তার সাথে বাকযুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে কোন দ্বিধা করে না।

যদি বলো, আমাদের ক্রোধান্বিত ও উত্তেজিত হওয়ার কারণ স্বামীর ক্রোধ ও উত্তেজনা। তাহলে শোনো! ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশের ক্ষেত্র তো এমন ব্যক্তি, যে নিজের চেয়ে ছোট কিংবা নিজের সমকক্ষ। মানুষ যাকে নিজের চেয়ে

বড় ও মর্যাদাশীল মনে করে, তার উপর কখনও ক্রুদ্ধ হয় না। যেমন, মনিবের উপর চাকর ক্রুদ্ধ হয় না। রাজার উপর প্রজা ক্রুদ্ধ হয় না। পিতার উপর পুত্র ক্রুদ্ধ হয় না। কেননা পুত্র পিতাকে নিজের চেয়ে বড় ও মর্যাদাশীল মনে করে।

স্বামীর ক্রোধের কারণে তোমাদের ক্রুদ্ধ হওয়া একথা প্রমাণ করে যে, তোমরা নিজেদেরকে স্বামীর চেয়ে বড় কিংবা তার সমকক্ষ মনে করো। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। যদি নিজেকে স্বামীর চেয়ে ক্ষুদ্র ও তার অধীনস্ত মনে করতে, তাহলে স্বামী যতই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হোক না কেন, তোমরা কিছুতেই তার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে না। নিজেকে স্বামীর সমকক্ষ কিংবা তার চেয়ে বড় মনে করার ভ্রান্ত চিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখো এবং স্বামীর ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখো।

স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদাগত অবস্থান

হে নারীগণ! স্বামীর কাছে তোমাদের মর্যাদা ক্রীতদাসীর চেয়েও কম। কারণ হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে স্ত্রীকে হুকুম দেয়া হতো, যেন স্বামীকে সিজদা করে। হাদীসে এরূপ বলা হয়নি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীকে হুকুম দেয়া হতো, যেন তারা নিজেদের মনিবকে সিজদা করে। সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, স্বামীর কাছে তোমাদের মর্যাদা ক্রীতদাসীর চেয়েও কম।

অথচ তোমাদের অবস্থা হলো, স্বামীর আনুগত্য করাকে তোমরা নিজেদের জন্য অবমাননাকর মনে করো। স্বামীর আদেশ পালন করাকে শরীয়তের হুকুম মনে করো না। কিছু দোয়া দুরূদ ও সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ অধিক হারে পড়াকেই তোমরা একমাত্র দ্বীন মনে করো। আমার মতে তোমাদের এ দোয়া-দুরূদ ও তাসবীহ জপার ফযীলত স্বামীর আনুগত্য ও তার আদেশ পালন করার চেয়ে অনেক কম। অধিক সাওয়াব ও ফযীলত তো সেই কাজে যা নফস্ ও প্রবৃত্তির পরিপন্থী হয়। আর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তার আনুগত্য করা নফস্ ও প্রবৃত্তির পরিপন্থী কাজ; এজন্য তার ফযীলত দোয়া দুরূদ ও তাসবীহ পাঠের চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষ নিজের সংশোধনের জন্য পীর সাহেবের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে থাকে। পীর সাহেব বাই'আত গ্রহণকারী মুরিদদের সংশোধন করেন। কিন্তু নারীর জন্য বাই'আতের পীর যথেষ্ট নয়। কারণ, পীরের পক্ষে সম্ভব নয় তাকে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করা। নারীর জন্য প্রয়োজন 'বাইত' (ঘর)-এর পীর। আর

ঘরের পীর হলো গৃহকর্তা- অর্থাৎ, স্বামী। সে সর্বক্ষণ গৃহে অবস্থান করে। তার পক্ষেই সম্ভব স্ত্রীকে সার্বক্ষণিক পরিচালনা করা। এ পীর নারীর জন্য বাই'আত-এর পীরের চেয়ে অধিক কার্যকর ও কল্যাণকামী। তার মর্যাদাও শরীয়তে বাই'আতের পীরের চেয়ে বেশি।

কারণ, সে একদিকে যেমন স্ত্রীর দ্বীন ও শরীয়ত সংশোধন করে, অপরদিকে তার যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজনও পূরণ করে। মোটকথা, স্বামী তার স্ত্রীর দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেরই দায়িত্বশীল। স্বামীর এ বৈশিষ্ট্যগুলো বাই'আতের পীরের মধ্যে কোথায় ? তার দ্বারা দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণ হয় না। উপরন্তু তার জন্য ঘর থেকে বিভিন্ন হাদিয়া-তোহ্ফা নিয়ে যেতে হয়। দ্বীনী উপকারও তার দ্বারা ততটুকু সাধিত হয় না, যা স্বামীর দ্বারা হয়। কেননা পীর সাহেবের মাধ্যমে এতটুকুই শুধু হতে পারে যে, কদাচিৎ কখনও তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে দ্বীনী কোন বিষয় জিজ্ঞেস করলে তিনি তা বলে দিবেন। কিংবা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তাৎক্ষণিক কিছু সংশোধন করে দিবেন। এ সুযোগ তো দু'চার বছরেও একবার হয় না। বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে তো এ সুযোগ আরো কম আসে। পক্ষান্তরে বাইত (ঘর)-এর পীর (স্বামী) সর্বক্ষণ স্ত্রীর কাছেই উপস্থিত থাকে। তার প্রতিটি কথায় ও কাজে তাকে সংশোধন করে দেয়ার সুযোগ থাকে। তাই আমার মতে স্ত্রীর জন্য বাই'আতের পীরের তুলনায় বাইত (ঘর)-এর পীর অধিক উপযোগী।

আবার কোন কোন নারীর জন্য বাইত (ঘর)-এর পীরের পরিবর্তে "বেত" (ছড়ি)-এর পীর অধিক উপকারী। অর্থাৎ, যে সব নারীর মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা ও শালীনতা রয়েছে, তাদের জন্য তো স্বামীর উপদেশ ও মৌখিক শাসনই যথেষ্ট। কিন্তু যারা সভ্যতা, ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা বিবর্জিত হবে, তাদের জন্য বেত (ছড়ি)-এর পীর অধিক কার্যকর। প্রয়োজনবশত তাদেরকে ছড়ি দ্বারা শাসন করার অনুমতি রয়েছে।

স্ত্রী-স্বামীর চেয়ে উত্তম হতে পারে

অনেকে মনে করে, 'স্বামীর উপর স্ত্রীর কোন শ্রেষ্ঠত্বই থাকতে পারে না। সর্বাবস্থায় স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে। স্বামীর তুলনায় স্ত্রী তুচ্ছ।' এটা ভুল ধারণা। কোন কোন বিষয়ে স্ত্রী স্বামীর সমতুল্য এমনকি তার চেয়ে অগ্রগামীও হতে পারে। যেমন- স্ত্রী যদি নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগী ও শরয়ী হুকুম-আহ্কাম পালনে স্বামীর তুলনায় অধিক যত্নবান হয়, তাহলে অবশ্যই তার মর্যাদা স্বামীর চেয়ে অধিক হবে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অধিক ইবাদতগুজার ও ধর্ম-পরায়ণ হওয়ার সুবাদে তার উপর স্বামীর আনুগত্য আবশ্যক থাকবে না। বরং স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্ত্রীকে সর্বাবস্থায়ই করতে হবে।

কেননা শ্রেষ্ঠত্ব দু'দিক থেকে। (এক) বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে। এ সম্পর্কের দাবী অনুযায়ী স্বামীর উপর স্ত্রীর কোনভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং সর্বাবস্থায় স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে। শরীয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীর যে অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে তার কারণে স্বামীর এ শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। (দুই) ইবাদত ও ধার্মিকতার দিক থেকে। ইবাদত ও ধার্মিকতায় স্ত্রী স্বামীর চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে। হতে পারে মহান আল্লাহর কাছেও তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের মাপকাঠি হলো ইবাদত ও ধার্মিকতা। কিন্তু তাই বলে এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুবাদে স্ত্রী স্বামীর মাখদূম (সেব্য) হতে পারে না। বরং তাকে স্বামীর খাদেম (সেবক) হয়েই থাকতে হবে।

আল্লাহ ও রাসূলের পর সর্বাধিক হক স্বামীর

স্মরণ রাখবে, দ্বীন ও শরয়ী হুকুম-আহ্কাম ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার পীর সাহেবের অধিকারের চেয়ে বেশি। স্বামীর নির্দেশ দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী না হলে তার উপর অন্য কারো নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ ও রাসূলের পর স্বামীর অধিকার সকলের উর্ধ্বে।

স্বামী কোন কাজের নির্দেশ দিলে এবং তা শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে পীর সাহেব উক্ত নির্দেশ পালনে বাধা দিলে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর নির্দেশ ত্যাগ করে পীর সাহেবের হুকুম পালন করাই জরুরী। কারণ, এখানে পীর সাহেবের হুকুম মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম।

অতএব, বলা যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করে স্বামীর নির্দেশ পালন করা জায়েয নেই। এ ক্ষেত্রে সকল নারী সমান। চাই সে পীর গ্রহণ করে থাকুক বা না করে থাকুক। যার পীর নেই তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে।

মোটকথা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক তো নিঃসন্দেহে স্বামীর হকের চেয়ে অধিক। অন্য কারো হককে স্বামীর হকের উপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। তবে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম যেহেতু সকলের জানা থাকে না। বরং আলিম-উলামা ও পীর সাহেবগণ থেকে জেনে নিতে হয়। তাই রূপক অর্থে বলা হয় যে, দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে আলিম-উলামা ও পীর সাহেবগণের হুকুম পালন করা স্বামীর হুকুমের চেয়ে অধিক জরুরী।

তবে স্বামীর হুকুম যদি দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী না হয়, তাহলে স্বামীর উপর কারো হুকুমকেই প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ নেই। সে ক্ষেত্রে স্বামীর হুকুমই সর্বাগ্রে পালনীয়।

স্বামীর আনুগত্যের সীমারেখা

স্ত্রীর উপর যদি প্রতিটি বিষয়েই স্বামীর আনুগত্যের নির্দেশ থাকতো, তাহলে অনেক মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে বঞ্চিত হতো। অথচ মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ"

"আমি মানব ও জীন জাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই শুধু সৃষ্টি করেছি।" এ আয়াতে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত তথা তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে নেয়া। এজন্য মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ হাদীস সূত্রে বর্ণিতঃ

"لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ"

"স্রষ্টার অবাধ্যতার মাধ্যমে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।" অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোন মানুষের হুকুম পালন করার ইখতিয়ার আল্লাহ কাউকে দেননি।

যদি কেউ স্ত্রীর প্রতি যাকাত আদায় না করার, নামাজ না পড়ার, দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ না করার কিংবা এ জাতীয় শরীয়ত বিরোধী কোন হুকুম করে, তাহলে তার জন্য তা পালন করা হারাম, বরং উক্ত অন্যায় হুকুম অমান্য করা তার উপর ফরজ। তবে যদি কোন মুসতাহাব কাজ ত্যাগ করার আদেশ করে, তাহলে উক্ত আদেশ পালন করা জরুরী।

বর্তমানে নারীদের বিভিন্ন ফ্যাশন গ্রহণ আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। এ ফ্যাশন গ্রহণ করতে গিয়ে বিজাতিসমূহের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও গঠন আকৃতির অনুসরণ করা হয়। অনেক সময় স্ত্রী এ জাতীয় কুরুচিপূর্ণ ও শরীয়ত বিরোধী পোশাক ও আকৃতি গ্রহণ করতে না চাইলেও স্বামী তাকে বাধ্য করে। স্মরণ রাখা উচিত, মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ"

"আল্লাহর নাফরমানী করে মাখলুকের আনুগত্য করা যায় না।"

অতএব, স্ত্রীর উচিত স্বামী এ জাতীয় কোন নির্দেশ দিলে তা থেকে বিরত থাকা। কেননা এ জাতীয় পোশাক পরার দ্বারা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।

মোটকথা, জায়েয ও মাকরূহ তানযিহী বিষয়সমূহে স্বামীর হুকুম পালন করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামীর হুকুমের কারণে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ ত্যাগ করা জায়েয নেই।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক

স্বামীর খিদমত ও সেবাযত্নে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কোন জায়েয কাজও স্ত্রীর জন্য করার অনুমতি নেই। ইসলাম স্ত্রীর উপর স্বামীর যে হক নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা আর কারো জন্য করেনি। তবে স্বামীর যে কোন হুকুমই পালন করা আবশ্যক নয়। স্বামীর ঐ সমস্ত হুকুমই পালন করা আবশ্যক, যা শরীয়ত বিরোধী নয় কিংবা যা অমান্য করলে স্বামী কষ্ট পাবে বা তার খিদমতে ব্যাঘাত ঘটবে। মোটকথা, স্বামীর খিদমত ও সেবাযত্নে উদাসীন থাকা উচিত নয়। তার হক আদায়ে সদা সতর্ক থাকা আবশ্যক।

স্বামীর গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ ঃ

এক. স্বামীর খিদমত ও সেবাযত্নে সদা সচেষ্ট থাকা এবং তার কাম চাহিদা পূরণ করা।

দুই. স্বামী যখন কাছে থাকবে, তার অনুমতি ছাড়া নফল নামাজ ও নফল রোজায় মগ্ন না হওয়া।

তিন. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার গৃহ ছেড়ে কোথাও না যাওয়া। এমন কি আত্মীয়-স্বজনের গৃহেও না যাওয়া।

চার. নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করে ময়লা-দুর্গন্ধময় এবং নোংরা -অপরিচ্ছন্ন না থাকা। বরং স্বামীর সামনে সর্বদা সুসজ্জিত হয়ে থাকা। এমনকি স্বামী আদেশ করা সত্ত্বেও সাজ-সজ্জা গ্রহণ না করলে এর্জন্য দৈহিক শাসন প্রদানের অনুমতি রয়েছে।

পাঁচ. সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করে চলা, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয়।

ছয়. স্বামীর আর্থিক ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কোন কিছু তার কাছে দাবী না করা।

সাত. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে গৃহে প্রবেশ করতে না দেয়া।

আট. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ হতে কাউকে কোন কিছু না দেয়া।

নয়. স্বামী দৈহিক মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে (শরয়ী কোন অন্তরায় যেমন- হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি না থাকলে) সেটা অস্বীকার না করা।

দশ. স্বামীকে তার অভাব অনটন কিংবা দৈহিক অবয়বে দৃষ্টিকটু হওয়ার কারণে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সাথে না দেখা।

এগার. স্বামীর মধ্যে দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলে তা থেকে তাকে আদব ও সম্মানের সাথে নিবৃত্ত রাখা।

বার. স্বামীর নাম ধরে না ডাকা।

তের. স্বামীর বিরুদ্ধে কারো কাছে অভিযোগ না করা।

চৌদ্দ. স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত না হওয়া।

পনের. স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করে সদা ভালো ব্যবহার করা।

স্বামীকে দ্বীনদার বানানো স্ত্রীর দায়িত্ব

স্বামীর ধার্মিকতার ব্যাপারে মহিলারা বড়ই অবহেলা করে থাকে। স্বামীকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য তারা কোন চেষ্টাই করে না। স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের জীবিকার জন্য স্বামী হারাম-হালাল ভেদাভেদ করে না। সুদ-ঘুষের আশ্রয় নেয়। শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন অবৈধ পন্থা গ্রহণ করে। অথচ স্ত্রী এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তার তো দায়িত্ব ছিলো তাকে হারাম উপার্জন হতে বিরত রাখা এবং সে হালাল উপায়ে যা কিছু উপার্জন করে, তা অপর্যাপ্ত হলেও তার উপর সন্তুষ্ট থাকা। স্বামী নামাজে অবহেলা করলে তাকে নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। অথচ আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার দ্বারা সব কিছুই করিয়ে নেয়।

স্ত্রী স্বামীকে দ্বীনদার বানাতে চাইলে তা তার জন্য মোটেও কঠিন নয়। তবে এজন্য প্রয়োজন প্রথমে নিজে দ্বীনদার হয়ে যাওয়া এবং নামাজ, রোজা ও শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহ্কামের প্রতি পরিপূর্ণ যত্নশীল হওয়া। তখনই স্বামীকে কোন উপদেশ করলে তা ফলদায়ক হবে।

স্ত্রী সামান্য সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিলেই স্বামী দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু হতে বাধ্য হবে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ করে বললো, তুমি ঘুষ ত্যাগ না করলে, যাকাত আদায় না করলে এবং নামাজের ব্যাপারে যত্নবান না হলে আমি তোমার উপার্জন ভোগ করবো না। ফলে একদিকে স্বামী-স্ত্রী মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক, অপরদিকে স্ত্রীর ইখলাসপূর্ণ নসীহতের বরকত– এ উভয়টি একত্রিত হওয়ার ফলাফল এই হলো যে, স্বামী ঘুষ গ্রহণ ত্যাগ করলো এবং নামাজ ও যাকাত আদায়ে যত্নবান হয়ে গেলো।

স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর হক

এক. নিজের সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজন পূরণে কার্পণ্য না করা।

দুই. স্ত্রীকে জরুরী মাস'আলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া এবং ভালো কাজ ও নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

তিন. স্ত্রীর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদাচরণ করা এবং স্ত্রীকে মাঝে মাঝে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া।

চার. স্ত্রীর ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। কখনও তাকে সতর্ক করার প্রয়োজন হলে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা। মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা, রূঢ় আচরণ না করা।

পাঁচ. স্বামীর আনুগত্য করা। তার আদব রক্ষা করে চলা। তাকে যথাযথ সম্মান করা তার খিদমত ও সেবাযত্ন করা এবং তার সন্তুষ্টি ও মনোরঞ্জনের জন্য সচেষ্ট থাকা। তবে স্বামী কোন শরীয়ত বিরোধী কাজের কথা বললে তা সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

ছয়. স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু তার কাছে দাবী না করা।

সাত. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার মাল খরচ না করা।

আট. স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সাথে এমন রূঢ় আচরণ না করা, যা দ্বারা স্বামী কষ্ট পায়। বিশেষত স্বামীর মা-বাবাকে বিশেষ সম্মানের পাত্র মনে করা এবং তাদের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল ইবাদত

স্বামী গৃহে থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া নফল নামাজ, নফল রোজা এবং অন্য যে কোন নফল ইবাদত জায়েয নেই। কেননা হতে পারে এর দ্বারা স্বামীর খিদমত ও সেবা-যত্নে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তবে যদি স্বামীর পক্ষ হতে অনুমতি থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। হাদীসে স্বামী গৃহে থাকাকালীন সময়ে তার অনুমতির শর্তারোপ করা হয়েছে। স্বামী সফরে কিংবা গৃহের বাইরে থাকলে তার অনুমতি ছাড়া নফল ইবাদত জায়েয।

হাদীসে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, যে সব কাজ স্বামীর হুকুম পালনে অন্তরায় হবে, তার কোনটিই স্বামীর অনুমতি ছাড়া জায়েয নেই।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া পীরের হাতে বাই'আত হওয়া

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন পীরের হাতে বাই'আত হওয়া জায়েয। তবে যদি এজন্য স্বামীর পক্ষ হতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে বাই'আত না হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। স্বামী যদি বাই'আত হতে নিষেধ করে, অথচ স্ত্রীর বাই'আত হওয়ার আগ্রহ থাকে, তাহলে স্ত্রী সাহস ও মনোবলসম্পন্ন হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে বাই'আত হয়ে যাবে। যদি এ কারণে স্বামীর পক্ষ হতে কোন সমস্যা বা পেরেশানী আসে, তাহলে ধৈর্যের সাথে তা মুকাবিলা করবে। অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবে না। যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদের উপরই বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে। পরকালে এর জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।

স্বামী মাকরূহ্ তানযিহী কোন কাজের হুকুম করলে

স্বামী যদি এমন কোন কাজের হুকুম করে যা মাকরূহ তানযিহী, তাহলে স্ত্রী সাহস ও মনোবলসম্পন্ন হলে তা করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় স্বামীর আদেশ পালন করবে। আর যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করে- যেমন যাকাত, ফরজ নামাজ ত্যাগ করার কথা বললো কিংবা গায়রে মাহ্রাম থেকে পরদা না করার কথা বললে, তাহলে তার এ হুকুম পালন করা হারাম এবং তার বিরোধিতা করা ফরজ। আর যদি কোন মুসতাহাব কাজ ত্যাগ করার হুকুম করো তাহলে তা পালন করা ওয়াজিব।

আত্মীয় বা শাশুড়ীর খিদমত

স্বামী যদি বিশেষ কোন ওযর ছাড়া স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের কোন আত্মীয় বা অন্য কারো কোন জায়েয কাজ করাতে চায়, তাহলে তা তার উপর আবশ্যক নয়। যেমন,স্বামী স্ত্রীকে কারো খাবার রান্না করে দিতে, কাপড় সেলাই করে দিতে কিংবা অন্য কোন কাজ করে দেয়ার নির্দেশ দিলো। তবে যুক্তিসঙ্গত কোন ওযর থাকলে স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কাজ করে দেয়া আবশ্যক। কেননা তা না করে দিলে স্বামী কষ্ট পাবে। আর স্বামীকে কষ্ট না দেয়াও তার দায়িত্ব।

অনেকে স্ত্রীকে নিজের মায়ের শাসনাধীন ও অধীনস্ত বানিয়ে রেখে নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করে এবং এজন্য স্ত্রীর উপর চলতে থাকে বিভিন্ন প্রকার জুলুম-নির্যাতন। স্মরণ রাখা উচিত যে, শাশুড়ীর খিদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। নিজে সৌভাগ্যবান হতে চাইলে নিজ হাতে মায়ের খিদমত করবে কিংবা তার খিদমতের জন্য চাকর-চাকরাণী নিয়োগ করবে। স্ত্রীকে মা-বাবার খিদমতে বাধ্য করার অধিকার স্বামীর নেই।[১]

আইন এবং ভালোবাসা এক নয়। এখানে বলা হয়েছে আইনের কথা। আইন হলো স্ত্রী শুধুমাত্র স্বামীর জন্য। স্পষ্ট অবগতির জন্য ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কারো কোন কাজ করে দিতে চায়– যেমন কাপড় সেলাই করে দেয়া ইত্যাদি– তাহলে সেই ব্যক্তি যদি সৎ ও দ্বীনদার হয় এবং কোন ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি সৎ ও দ্বীনদার না হলে এবং ফিৎনা সৃষ্টির আশংকা থাকলে তা জায়েয নেই। কেননা অনেক অসৎ চরিত্রের লোক সেলাইকারিনীর সেলাই দেখে দেখে চোখের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে।

স্ত্রীর নিজস্ব মাল খরচ করার হুকুম

স্ত্রীর নিজস্ব মাল কোন বৈধ পথে খরচ করতে চাইলে স্বামী যদি নিষেধ করে, সে নিষেধাজ্ঞা পালন করা আবশ্যক নয়। কোন শরয়ী কারণে নিষেধ করলে ভিন্ন কথা। তবে স্বামী-স্ত্রীর আপোষে ঝগড়া ও মনোমালিন্য যেহেতু সুখের কথা নয়। তাই যা কিছু করবে যথাসাধ্য স্বামীর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শের ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়।

অনেক পুরুষ দ্বীনদার না হওয়ার কারণে স্ত্রীর ভালো কাজকেও সহ্য করে না। স্ত্রী ভালো ও মহৎ কোন কাজ করতে চাইলে তাতেও বাধা প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, উদ্দিষ্ট কাজটি কোন পর্যায়ের। যদি তা জায়েয কিংবা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের হয়, তাহলে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে স্বামীর আনুগত্য করাই সংগত। কিন্তু উক্ত কাজ ফরজ, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পর্যায়ের হলে স্বামীর নিষেধাজ্ঞা বা বাধা প্রদান সত্ত্বেও তা করা অপরিহার্য।

একটি জরুরী মাস'আলা ঃ

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদের মালিকানা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক পৃথক। যে সব বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং তাতে যে কোন হস্তক্ষেপের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্ত্রীর থাকবে, সেগুলোর মালিক স্ত্রী। আর যে সকল বস্তুতে উক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্বামীর থাকবে, সেগুলোর মালিক স্বামী।

স্বামী ও স্ত্রী একজনের মালের সাথে অপরজনের মাল মিশ্রিত হওয়ার ফলে যদি তা যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সুতরাং স্বামী যদি এ কথা বলে স্ত্রীকে যাকাত আদায় করতে নিষেধ করে যে, আমি মালিক হওয়া আর তুমি মালিক হওয়া তো একই কথা, তাহলে কিছুতেই তার নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করবে না। কেননা যাকাত আদায়ে নিষেধ করা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ। আর আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা যায় না।

স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ

স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা একটি সাওয়াবের কাজ। স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জায় থাকার জন্য স্ত্রীর প্রতি শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে।

বর্তমানে নারীদের অবস্থা হলো, স্বামীর সামনে তারা নোংরা অপরিচ্ছন্ন ও ময়লা কাপড়-চোপড় পরে থাকে। আর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় আপাদ-মস্তক সুসজ্জিত হয়ে যায়। কেউ স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করলে সমালোচনা শুরু হয়ে যায় যে, মেয়েটির লাজ-লজ্জা বলতে কিছু নেই- স্বামীর সামনে সে কেমন রূপচর্চা করছে!

পরিতাপের বিষয়! যেখানে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা উচিত সেখানে তা নিন্দনীয়। আর যেখানে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা অনুচিত সেখানে তা প্রশংসনীয়। স্বামী যখন স্ত্রীর সাজ-সজ্জা কামনা করে তখন তা গ্রহণ না করার কি যুক্তি থাকতে পারে ?

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মহিলারা স্বগৃহে তো বাঁদী-দাসী ও গৃহপরিচারিকার ন্যায় অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে। আর যখন কোন বিশেষ অতিথির আগমন ঘটে, তখন বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ নববধূ বনে যায়।

প্রতিটি জিনিসের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। আমার প্রশ্ন, ভালো কাপড়-চোপড় পরিধানের উদ্দেশ্য কি শুধু অন্যদেরকে দেখানো ? অদ্ভুত কাণ্ড! যাকে দেখানোর জন্য এ কাপড়-চোপড় ও সাজ-পোশাক তৈরি হয়েছে, যার টাকায় তৈরি হয়েছে, তার সামনে তা পরিধান না করে অন্যদের সামনে পরিধান করা হয়। বিষয়টি কিছুটা লজ্জাজনক হলেও সংশোধনের প্রয়োজনে বলতে হচ্ছে।

আঁজকালকার স্ত্রীরা স্বামীর সাথে কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলবে না। তার সামনে ভালো কাপড়-চোপড় পরিধান করবে না। অথচ অন্যের গৃহে গেলে সুমিষ্টভাষী বনে যাবে, সুন্দর থেকে সুন্দরতম এবং উন্নত থেকে উন্নততর সাজে সজ্জিত হবে- এ কেমন কথা ? অর্থ খরচ করবে স্বামী আর উপভোগ করবে অন্যরা ?

একটি জরুরী ফতোয়া

প্রশ্ন ঃ মা-বাবার প্রতি লক্ষ্য করতে গিয়ে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ না দেয়া কিংবা তাতে সংকোচন করার শরয়ী হুকুম কি ?

উত্তর ঃ শরীয়ত যে বিষয়টিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে, তা পালনে মা-বাবা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের কথা পালন করা জায়েয নেই। যেমন- কারো অর্থনৈতিক অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে মা-বাবার পেছনে খরচ করতে

গেলে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি কষ্ট পাবে, এমতাবস্থায় মা-বাবার পেছনে খরচ করে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে কষ্ট দেয়া জায়েয হবে না।

অনুরূপ স্ত্রীকে মা-বাবার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা তার অধিকার। স্ত্রী যদি উক্ত অধিকার বলে মা-বাবা থেকে পৃথক থাকতে চায়, আর মা-বাবা তাতে সম্মতি না দেয়, তাহলে মা-বাবার অসম্মতি সত্ত্বেও তাকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। (ইমদাদুল ফাতাওয়া)

এক মহীয়সী নারীর ঘটনা

জনৈকা মহীয়সী রমণীর ঘটনা ঃ

সে প্রতিরাত এশার নামাজের পর খুব সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতো। সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে হাতে, গলায় ও কানে অলংকার পরে এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে এ অবস্থায় স্বামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো, আমাকে আপনার প্রয়োজন আছে কি ? যদি সে বলতো, হাঁ আছে! তাহলে সাথে সাথে তার কাছে শুয়ে যেতো। আর যদি বলতো, না আমার প্রয়োজন নেই, তখন সে বলতো, তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদতে মাশগুল হই। স্বামীর অনুমতি লাভের পর সে পরিধেয় পোশাক ও অলংকার খুলে ফেলে সাদা কাপড় পরে গোটা রাত নির্জন ইবাদতে কাটিয়ে দিতো।

চিন্তা করুন! উক্ত আল্লাহওয়ালা নারী রাতের এক অংশে কেমন সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতো! আবার অন্য অংশে কেমন মোটা ও সাদা-মাটা কাপড় পরিধান করতো, সুসজ্জিত অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে অবশ্যই বলবে! এ আবার কেমন আল্লাহ ওয়ালা, যার কাছে সাজ-সজ্জার এমন গুরুত্ব! কিন্তু এটা তো আর কারো জানা নেই যে, এ সাজ-সজ্জা সে কেন গ্রহণ করছে? বস্তুত তার এ সাজ-সজ্জা গ্রহণ নফসের চাহিদা পূরণ করার জন্য ছিলো না। বরং স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ যেহেতু শরীয়তের নির্দেশ। তাই সে তা করতো। আর এ উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ দূষণীয় তো দূরের কথা বরং বিশেষ সাওয়াবের কাজ।

যেখানে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা শরীয়তের নির্দেশ, সেখানে তা সে যথাযথভাবে গ্রহণ করতো। কারণ, স্বামী স্ত্রীকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে, তার জন্য অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয নেই। স্বামীর কোন চাহিদা যখন তার প্রতি থাকতো না, তখন আর তার কাছে সাজ-সজ্জার কোন গুরুত্ব থাকতো না। কেননা স্বামীর চাহিদা ছাড়া সাজ-সজ্জা গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রবৃত্তির অনুসরণ। বস্তুত আল্লাহওয়ালাগণ যে কোন কাজ করা ও না করার ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে কোন কিছু করেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
স্বামীর আনুগত্য

স্মরণ রাখা উচিত, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এমন এক স্থায়ী সম্পর্ক, যা নিয়ে গোটা জীবন অতিবাহিত করতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুখকর হলে, উভয়ের মাঝে অন্তরের মিল থাকলে এবং একজনের প্রতি অপরজনের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালোবাসা থাকলে এর চেয়ে বড় নে'আমত পৃথিবীতে নেই। আল্লাহ্ না করুন উভয়ের মাঝে যদি অন্তরের অমিল হয়ে যায়, তাহলে এর চেয়ে বড় আযাব আর কিছু নেই। এজন্য যথাসাধ্য স্বামীর মন জুগিয়ে এবং তার মনোরঞ্জন করে চলা উচিত। তার হাতের ও চোখের ইশারার উপর চলা উচিত। স্বামী সারা রাত হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ করলে তাতেই স্ত্রীর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। কেননা দুনিয়ার এ সামান্য কষ্টের বিনিময়ে পরকালে রয়েছে পরম সৌভাগ্য ও শান্তি। স্বামীর স্বভাব ও তবীয়তের খেলাফ কোন কাজ কখনও করা উচিত নয়। স্বামী রাতকে দিন বললে তাই মেনে নেয়া উচিত।

স্বামীর মেজাজ-তবীয়তের প্রতি লক্ষ্য রেখে তদনুযায়ী চলবে। তার মেজাজ-তবীয়ত লক্ষ্য করে চলাও তার আনুগত্যের অংশ। স্বামী যদি এখন হাসি-আনন্দ ও খোশ গল্পে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে স্ত্রীর তখন তাই করা উচিত। অন্যথায় হাসি-আনন্দ ও খোশ গল্প করা উচিত নয়। মোটকথা, স্বামীর মেজাজ-তবীয়ত যখন যেমন থাকবে, তখন তেমন করা আবশ্যক।

মনে রাখবে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিছক শুধু মহব্বত ও ভালোবাসারই নাম নয়। বরং মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে সাথে স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করাও স্ত্রীর দায়িত্ব। স্বামীকে নিজের সমকক্ষ কিংবা সমমর্যাদার মনে করা খুবই অন্যায় কথা।

স্বামী থেকে কিছুতেই কোন প্রকার খিদমত নেয়া উচিত নয়। স্বামী যদি মহব্বত ও ভালোবাসার আতিশয্যে কখনও স্ত্রীর হাত পা দাবিয়ে দিতে শুরু করে, তাহলেও তাকে তা করতে দেয়া উচিত নয়। যেমন কারো মা-বাবা যদি এরূপ তার শারীরিক খিদমত করতে চায়, তাহলে কি সে তা পছন্দ করবে? অথচ স্বামীর মর্যাদা তো মা-বাবার চেয়ে অনেক বেশি। অতএব, কথা-বার্তা, চাল-চলন ও আচার-আচরণে স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু তার কাছে দাবী করা সমীচীন নয়।

ডাল-ভাত, চাটনি-রুটি যা কিছু মিলবে আপন ঘর মনে করে তাতে পরিতুষ্ট থাকবে। কখনও কোন কাপড়, অলংকার বা এ জাতীয় কোন বস্তু পছন্দ হয়ে গেলে যদি স্বামীর কাছে টাকা না থাকে তা কিনে দেয়ার আবদার করতে যাবে না। এমন কি তা মুখ থেকেও বের করবে না এবং তার জন্য কোনরূপ আক্ষেপও করবে না। কারণ, স্বামীর ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি তা চাইতে যাও, তাহলে সে দুঃখ পাবে এবং মনে মনে বলবে, আমার এ অসময়ে আমার প্রতি তার কোন দরদ নেই। বরং স্বামীর সাধ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার কাছে কোন কিছুর আবদার করা হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বামী নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলে তখন বলা যেতে পারে। নিজের থেকে চাওয়া উচিত নয়। কারণ, চাওয়ার দ্বারা মানুষ অন্যের দৃষ্টিতে খাটো হয়ে যায় এবং নিজের ওযনও কমে যায়।

স্বামী সফর থেকে ফিরে এলে কি করণীয়

স্বামী যখন সফর থেকে ফিরে আসবে, সাথে সাথে তার মেজাজ-তবীয়ত জিজ্ঞেস করবে। তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিবে। সেখানে কেমন ছিলো ? সুস্থ ছিলো কিনা, কোন কষ্ট হয়েছে কিনা ইত্যাদি। তার হাত-পা জড়িয়ে ধরে গভীর মমতার সাথে বলবে, 'আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, আপনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন।' ক্ষুধার্ত থাকলে দ্রুত তার খাবারের ব্যবস্থা করবে। গরমের দিন হলে পাখা নেড়ে তাকে বাতাস করবে। মোটকথা, যা করলে সে আরাম ও শান্তি পায়, তাই করবে। টাকা-পয়সার কথা, কি এনেছে না এনেছে, টাকা-পয়সা কত এনেছে, জিনিস পত্রের ব্যাগ কোথায়– ইত্যাদি প্রশ্ন করতে যাবে না। সে নিজের পক্ষ থেকে বললে ভিন্ন কথা। এমন প্রশ্ন করতে যাবে না যে, উপার্জন তো অনেক করো, এত মাস পর এত অল্প টাকা নিয়ে কেন এসেছো? টাকা কি কাজে ব্যয় করেছো? হাঁ! উপযুক্ত সময়মত কখনও হাসিখুশী অবস্থায় সুন্দরভাবে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করে নিলে ভিন্ন কথা।

স্বামীর যে কোন জিনিস সানন্দে গ্রহণ

স্বামী কোন জিনিস আনলে তা পছন্দ হোক বা না হোক সানন্দে গ্রহণ করা উচিত। এমন বলা উচিত নয় যে, এটা আমার পছন্দ হয়নি– এটা তুমি কি এনেছো? কারণ, এতে স্বামীর মন ভেঙ্গে যাবে এবং ভবিষ্যতে কখনও কিছু আনার আগ্রহ বোধ করবে না। আর যদি তার আনা জিনিসের প্রশংসা করে তা সানন্দে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করা হয়, তাহলে স্বভাবতই তার অন্তর খুশী হবে এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক আনতে উদ্বুদ্ধ হবে।

স্বামীর উপর রাগান্বিত হয়ে কখনও তার না-শোকর করা উচিত নয়। কখনও এ ধরনের বলবে না যে, এ পরিবারে এসে আমি কি পেলাম? সারা জীবন আমাকে দুঃখ-কষ্ট পেতে হলো। আমার মা-বাবাই আমার কপাল নষ্ট করেছেন, আমাকে এ বিপদে ফেলেছেন, অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করেছেন।

এ জাতীয় অকৃতজ্ঞতাসুলভ কথাবার্তা বলার পর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর স্থান থাকতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "আমি জাহান্নামে অনেক নারী দেখলাম।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণ কি?" তিনি বললেন, "এরা অধিক লা'নত দেয় এবং স্বামীর অধিক না-শোকরী করে।" সুতরাং চিন্তা করা উচিত যে, স্বামীর না-শোকরী করার পরিণতি কত ভয়াবহ।

স্বামীর জিনিসপত্রের হেফাজত

স্বামীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে সদা যত্নবান থাকবে। তার জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় অত্যন্ত যত্নের সাথে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে। কামরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন হতে দিবে না। বিছানা পরিষ্কার পরিপাটি রাখবে। বালিশ ময়লা হয়ে গেলে গিলাফ পরিষ্কার করে ফেলবে কিংবা নতুন গিলাফ লাগিয়ে নিবে। স্বামী বলার পর তুমি এ সব করলে, তাতে তো কৃতিত্বের কিছু থাকলো না। হৃদ্যতা ও ভালোবাসার পরিচয় তো তখন হবে, যদি স্বামী বলা ছাড়াই নিজের পক্ষ হতে সবকিছু সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখো। স্বামীর যে সব জিনিস তোমার কাছে আছে, সেগুলো যত্ন করে রাখবে। স্বামীর কাপড়-চোপড় ময়লা থাকলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে ভাঁজ করে রাখবে। এলোমেলো করে রাখবে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে। কখনও কোন কাজে বা কথায় চালাকি ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিবে না। কখনও এমন কোন মিথ্যা বলবে না, যার কারণে তার কাছে তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। কেননা একবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেলে ভবিষ্যতে তোমার সত্য কথায়ও সে আস্থা রাখতে পারবে না।

স্ত্রীর অপরিণামদর্শীতার পরিণাম

অনেক স্ত্রী নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শীতার কারণে এমন কথা বলে বসে, যার ফলে স্বামীর অন্তর বিগড়ে যায়। স্বামীকে কখনও অবাঞ্ছিত কিছু বলে ফেলে আবার কখনও অবমাননাকর ও আক্রমণাত্মক ভাষায় যা ইচ্ছা তা বলে বসে। ক্রোধ ও উত্তেজনার বশে কর্কশ কথা-বার্তা উচ্চারণ করে স্বামীর অন্তরকে

ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। অতঃপর স্বামী যখন বেঁকে বসে, তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকে।

মনে রাখবে, স্বামীর অন্তর একবার বিগড়ে যাওয়ার পর দু'চার দিনের মধ্যে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুনয় বিনয় করে তাকে মানিয়ে নিলেও অন্তরের সে সম্পর্ক আর থাকবে না, যা পূর্বে ছিলো। হাজার অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করেও সেই পরিচ্ছন্ন অন্তর ও নির্ভেজাল ভালোবাসা আর পাওয়া যাবে না, যা পূর্বে ছিলো। কোন কথা হতে না হতেই তার স্মরণে এসে যাবে যে, এ তো সে-ই, যে অমুক অমুক দিন আমাকে এমন এমন বলেছিলো।

এজন্য স্বামীর সাথে খুবই চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করে চলবে। এর দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূল খুশী হবেন। নিজের দ্বীন ও দুনিয়াও সুন্দর সুখকর হবে।

কখনও কোন কথায় বা কাজে একগুঁয়েমী করবে না। স্বামীর কোন কথা বা কাজ নিজের মনের খেলাফ হলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ না করে তাকে সুযোগ দিবে। পরে কখনও অনুকূল সুযোগ মত তাকে বুঝিয়ে বলবে।

স্বামীর বাড়ীতে দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিবাহিত করলেও তা কখনও মুখে উচ্চারণ করবে না। নিজের দুঃখ কষ্টের কথা তাকে বলতে যাবে না। সর্বদা হাসি-খুশীতে থাকবে। স্বামীর সাথে সকৃতজ্ঞ আচরণ করবে। তাহলে স্বামী দুঃখ পাবে না এবং তোমার এ মহৎ গুণের কারণে তার অন্তর সম্পূর্ণরূপে তোমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

স্বামীর উত্তেজনার মুহূর্তে কি করণীয়?

স্বামী কখনও অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ কালো করলে তুমিও তার সাথে মুখ ফুলিয়ে বসে থেকো না। বরং তোষামোদ করে, অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করে, ওযর-আপত্তি করে, হাতজোড় করে যেভাবে সম্ভব তাকে রাজী-খুশী করে নিবে। ত্রুটি যদি তোমার না হয়ে স্বামীর হয়, তাহলেও তার উত্তেজনার জবাবে তুমিও উত্তেজিত হয়ে যাবে না। বরং করজোড়ে নতি-স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা চাওয়াকে নিজের জন্য গর্ব ও মর্যাদার বিষয় মনে করবে।

আর যদি ত্রুটি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তো তোমার অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফুলিয়ে রাখা চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। এ জাতীয় আচরণের ফলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের দূরত্ব, মন কষাকষি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

স্বামী কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে গেলে তার মুখের উপর এমন কোন কথা বলা উচিত নয়, যার কারণে তার উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। উত্তেজনার বশে সে ভালো মন্দ কিছু বলে ফেললে তা বরদাশ্‌ত করে নিবে এবং জবাব দানে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত রাখবে। সে উত্তেজিত হয়ে অবিরাম বলতে থাকলেও নিরবে শুনে যাবে। উত্তেজনা অবদমিত হওয়ার পর দেখবে, সে নিজেই তোমার কাছে লজ্জিত হবে। উপরন্তু তোমার প্রতি তার আকর্ষণ ও ভালোবাসা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে কখনও তোমার প্রতি উত্তেজিত হবে না। আর যদি স্বামীর উত্তেজনার জবাবে তুমিও উত্তেজিত হতে থাকো, তাহলে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটে এর শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল।

পর নারীর প্রতি স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক থাকলে

ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এরূপ বলা উচিত নয় যে, "অমুক নারীর সাথে তোমার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। তার কাছে তোমার এত অধিক যাতায়াত কেন ? তার কাছে বসে বসে তুমি কি করো?"

কারণ, স্বামী যদি তোমার আরোপিত অপবাদ থেকে পবিত্র হয়ে থাকে, তাহলে নিজেই ভেবে দেখো- তার দুঃখ ও কষ্টের পরিমাণ কতটুকু হতে পারে। আর যদি সে বাস্তবেই অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে থাকে, তাহলে মনে রেখো তোমার রাগের কারণে, বকা-ঝকা দ্বারা এবং তার উপর তোমার চাপ সৃষ্টি ও শক্তি প্রয়োগের ফলে তুমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিজে নিজে যদি স্বামীর সাথে মনের বিভাজন সৃষ্টি করতে চাও, তাহলে এরূপ করতে পারো। এভাবে সরাসরি তার উপর অপবাদ আরোপের ফলে তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটবে তো দূরের কথা বরং উভয়ের মাঝে তিক্ততাই শুধু বৃদ্ধি পাবে। এজন্য স্বামীর এ অভ্যাস পরিবর্তন করতে হলে হিকমত ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। নিরবে, ঠাণ্ডা মাথায় ও অতি সতর্কতার সাথে তাকে বুঝানো অব্যাহত রাখবে। ফলে আল্লাহ যখন তাকে হেদায়েত করবেন, তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাবেন। তখন সে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে তোমার পরিপূর্ণ অনুগত হয়ে যাবে। আর যদি তোমার এ হিকমত ও কৌশলপূর্ণ পন্থা ও উপদেশ দান সত্ত্বেও তার অভ্যাসের পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে থাকো। মানুষের কাছে প্রকাশ করে তাকে লজ্জিত ও অপমানিত করবে না। এজন্য তাকে পদানত করারও চেষ্টা করবে না। কারণ, এর ফলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তার জিদ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ক্রোধের বশে সে পূর্বের তুলনায় আরো অধিক শুরু করে দিবে। যদি তুমি ক্রুদ্ধ-উত্তেজিত হয়ে এবং লোকের সামনে

তাকে বকাবকি করে লজ্জা দাও, তাহলে সে তার এ বদ-অভ্যাস সম্পর্কে তোমার কাছে পূর্বে যা প্রকাশ করতো, তাও প্রকাশ করবে না। ফলে তখন তোমার কেঁদে কেঁদে ফেরা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

স্বামীকে কাবু করার উপায়

অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে সিংহ করে সৃষ্টি করেছেন। চাপ ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে কখনও কাবু করা সম্ভব নয়। পুরুষকে কাবু করার সহজ উপায় হলো, তার তোষামোদ করা, আনুগত্য করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে তার সামনে নিজেকে পেশ করা। ক্রোধ-উত্তেজনা, চাপ ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে বশে আনার চেষ্টা করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শীতা ছাড়া কিছু নয়। এর অশুভ পরিণতি তৎক্ষণাৎ বোধগম্য না হলেও অচিরেই যখন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে চিড় ধরবে এবং উভয়ের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে, তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

শ্বশুরালয়ে কিভাবে থাকবে?

স্ত্রী স্বামীর পরিবারের লোকজনের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিলে মিশে চলবে। যাবতীয় আচরণ-উচ্চারণ, চলা-ফেরা ও কথা-বার্তায় সর্বোচ্চ আদব ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে। ছোটদেরকে স্নেহ করবে, বড়দেরকে সম্মান করবে। নিজের কোন কাজ অপরের জন্য রেখে দিবে না। নিজের কোন জিনিস অন্যের উপর নির্ভর করে ফেলে রাখবে না। শাশুড়ী ও স্বামীর বোনেরা পরিবারের যে সব কাজ করতে পারে, তা করতে সংকোচ বোধ করবে না। বরং নিজে আগে বেড়ে তাদের থেকে নিয়ে করে ফেলবে। ফলে তাদের অন্তরে তুমি বিশেষ অবস্থান লাভ করবে এবং তোমার প্রতি তাদের মায়া-মমতাও বৃদ্ধি পাবে।

ঘরে যে কোন দু'জনে একান্তে কথা বলার সময় তাদের থেকে দূরে অবস্থান করবে। কাছে থাকলেও দূরে সরে যাবে। দু'জনে কি বললো না বললো তা জানার জন্য পেছনে পড়বে না। তারা তোমার সম্পর্কে কিছু বলছে– এ জাতীয় অহেতুক ধারণা করতে যাবে না।

এ দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যে, শ্বশুরালয়ে যেন আদব ও শিষ্টাচার পরিপন্থী কোন কিছু তোমার থেকে প্রকাশ না পায়। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশে ও নতুন লোকজন হওয়ার কারণে প্রথম প্রথম তোমার মন না বসলেও মনকে বুঝিয়ে নিবে। সেখানে নিজ বাপের বাড়ির জন্য কান্নাকাটি করে বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করবে না। কারণ, যেখানের জন্য তোমার এ কান্নাকাটি, সেখানে যাওয়া মাত্রই তুমিই আবার আসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে।

অহেতুক কথা-বার্তা বলতে যাবে না। যা বলবে ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বলবে। নিজে এত অধিক কথা-বার্তা বলবে না, যা অন্যদের জন্য বিরক্তির কারণ হয়। আবার এমন নিরবতাও পালন করবে না যে, তোমার মুখ থেকে শব্দ বের করতে তোষামোদের প্রয়োজন হয়। কেননা এটাকেও মানুষ শিষ্টাচার-বিরোধী ও অহংকার মনে করে থাকে।

শ্বশুরালয়ে কারো কোন কাজ বা কথা তোমার মনের খেলাফ বা তোমার জন্য কষ্টদায়ক হলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে তা স্বামীর কাছে বা অন্য কারো কাছে প্রকাশ করবে না। শ্বশুরালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ বাপের বাড়ীতে এসে মায়ের কাছে বর্ণনা করা এবং মা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করে জানতে চাওয়া বড়ই খারাপ ও নিন্দনীয় কাজ। এসব কারণেই স্বামীর পরিবার ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে মন কষাকষি ও ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয়। এছাড়া আর কোনই ফায়দা নেই। স্বামীর মা-বাবা যদি জীবিত থাকে এবং স্বামী তার উপার্জিত সমস্ত টাকা-পয়সা মা-বাবার হাতে দিয়ে দেয়, তোমার হাতে না দেয়, তাহলে এটাকে আপত্তিকর মনে না করে বরং তুমি তার প্রশংসা করবে। এমনকি তোমার হাতে দিতে চাইলেও তুমি তা গ্রহণ না করে শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতে দেয়ার পরামর্শ দিবে। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই। এর ফলে তাদের অন্তর তোমার ব্যাপারে কালিমামুক্ত থাকবে। এবং তোমার উপর এ অভিযোগ আরোপ করার সুযোগ থাকবে না যে, বউ তাদের ছেলেকে আপন আয়ত্তে নিয়ে গেছে।

শাশুড়ী, ননদের সাথে সদাচরণ

মহান আল্লাহ্ কুরআনুল কারীমে নসব বা রক্ত সম্পর্কের সাথে সাথে শ্বশুরালয়ের সম্পর্কও বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পর্ক ও তাদের অধিকারের বিষয়টিও পারিবারিক জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সদাচরণ, উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচারের পরিচয় দেয়া আবশ্যক।

শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন জীবিত থাকবে, তাঁদের খিদমত সেবাযত্ন এবং তাঁদের আনুগত্যকে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে এবং এতেই নিজের সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস রাখবে। শাশুড়ী ও ননদদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার চিন্তা কখনও করবে না। কেননা শাশুড়ী ননদদের থেকে পৃথক থাকার চিন্তা করা মূলত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করারই নামান্তর। নিজে চিন্তা করে দেখো, মা-বাবা তোমার স্বামীকে কত কষ্টে লালন-পালন করলেন, বড় করলেন, মানুষ বানালেন। এখন বার্ধক্য বয়সে তারা একটু আরাম ও সুখ- শান্তিতে থাকার জন্য ছেলেকে বিয়ে করালেন। অথচ ঘরে নতুন বউ

আসার সাথে সাথেই এ চিন্তা শুরু হয়ে গেলো যে, ছেলে মা-বাবা ত্যাগ করে স্ত্রী নিয়ে পৃথক থাকবে। অতঃপর মা-বাবা যখন অনুভব করতে পারে, বউ ছেলেকে ফুসলিয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করছে, তখন শুরু হয়ে যায় বউ-শাশুড়ী ঝগড়া ও পারিবারিক বিশৃংখলা।

তবে এ কথাগুলো সম্পূর্ণ নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। অন্যথায় শরীয়তের নির্দেশ তো হলো, স্ত্রীকে মা-বাবা, ভাই-বোন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা, যা তার মৌলিক অধিকার। স্ত্রী তার এ অধিকার বলে স্বামীর মা-বাবা থেকে পৃথক থাকার দাবী করলে স্বামীর জন্য উক্ত দারী পূরণ করা আবশ্যক। বরং একসাথে থাকার ফলে যদি পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব কলহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তখন নৈতিকতার দাবীও এটাই যে, স্ত্রীকে মা-বাবা থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা।

সপ্তম অধ্যায়

মহিলাদের আপোষের ঝগড়া-বিবাদ

মহিলাদের আপোষের ঝগড়া-বিবাদ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। একবার কোন বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গেলে তার জের চলতে থাকে বহু দিন যাবৎ।

মহিলাদের আরেকটি বদঅভ্যাস হলো, যখন কোন কিছু নিয়ে কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন প্রতিপক্ষের মৃত বাপ-দাদা, চৌদ্দপুরুষকে কবর থেকে উত্তোলন করে ছাড়ে। তবে পুরুষদের মধ্যে এ অভ্যাসটি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু মহিলারা পূর্বের ঝগড়ায় উচ্চারিত যে কথাগুলো দ্বারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারবে, পুনরায় ঝগড়ার সময় তা আওড়াতে থাকে। ফলে তাৎক্ষণিক ঝগড়ার বিষয় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের ঝগড়ায় উচ্চারিত কথাবার্তা উত্থাপনের ফলে অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করে। বিশেষত পূর্বের কথাগুলোর তুলনাও যদি অন্তর বিদীর্ণকারী শব্দ দ্বারা হয়। আর এ বিষয়ে মহিলারা বড়ই পটু। এরা অপরকে আঘাত করার সময় তার প্রতি নিজের কৃত ইহ্সান ও অনুগ্রহের তুলনা এমন ভাষায় দেয় যে, তার কলিজা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।

নারী ও পুরুষের ক্রোধের পার্থক্য

পুরুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে উত্তাপ ও উষ্ণতা বিদ্যমান। এজন্য তাদের উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মারপিট, চিৎকার ও তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে। পক্ষান্তরে নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি নিরুত্তাপ এবং তাতে শীতলতা বিদ্যমান। অধিকন্তু নারীরা অপেক্ষাকৃত অধিক লজ্জাবতী হয়ে থাকে। ফলে তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ ঘটে না; যদিও তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনা পুরুষদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। বরং পুরুষদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। তারা এমন এমন ক্ষেত্রেও উত্তেজিত হয়ে যায়, যেখানে পুরুষদের উত্তেজিত হওয়ার চিন্তাও করা যায় না। কেননা বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি তাদের কম এবং অপরিণামদর্শীতা অনেক বেশি। ফলে তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশের ক্ষেত্রও অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া চিৎকার ও বিকট আওয়াজের মাধ্যমে পুরুষদের যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তার তুলনায় শীতল ক্রোধ অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়। শীতল ক্রোধের আগুন ধীরে ধীরে ধূমায়িত হতে থাকে। চিৎকার ও বিকট শব্দের দ্বারা ক্রোধ উত্তপ্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু শীতল ক্রোধের আগুন ধীরে ধীরে ধূমায়িত হয়ে তা মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

অতপর তা তীব্ররূপ লাভ করে বিদ্বেষে পরিণত হয়। এজন্য বিদ্বেষের উৎস হলো ক্রোধ। ফলে এখানে দু'টি অপরাধ– একটি ক্রোধ এবং অপরটি ক্রোধ থেকে সৃষ্ট বিদ্বেষ। আর কারো প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হলে তা আরো অনেক অপরাধের জন্ম দেয়। কেননা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ না ঘটলে তার আগুন অন্তরে ধূমায়িত হতে থাকে। ফলে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উত্তেজনাকর অবস্থা এবং তাকে আঘাত করার অনেক রকম ফন্দি-ফিকির। এজন্য ক্রোধ থেকে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তা শুধু একটি অপরাধই নয় বরং বহু অপরাধের উৎস ও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নারীদের বিদ্বেষ যেহেতু শীতল ক্রোধ হতে সৃষ্ট, যা তাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান। ফলে নারীদের ক্রোধ পুরুষদের তুলনায় অধিক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়। পুরুষদের ক্রোধের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ার কারণে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়ে সাথে সাথে তা নিস্তেজ হয়ে যায়।

মহিলাদের আপোষের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে অনেক সময় পুরুষদের মধ্যেও ঝগড়া-কলহ এমনকি রক্তপাত ও হানাহানি সৃষ্টি হয়ে যায়। এক মহিলার অপর মহিলার সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে উভয়ে আপন আপন স্বামীর কাছে এমনভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এবং সাথে আরো কিছু যুক্ত করে পেশ করে, যেন তারা প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠে। পুরুষদের উত্তেজনা তাৎক্ষণিক। ফলে ঝগড়ার বিবরণ শুনে তাদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, তা শুধু কথা-বার্তা ও তর্ক-বির্তকে সীমাবদ্ধ না থেকে একজন অপরজন থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয়ে উঠে। ফলে সৃষ্টি হয়ে যায় পুরুষে পুরুষে রক্তপাত ও হানাহানি।

মহিলাদের আরেকটি অত্যন্ত ঘৃণিত অভ্যাস হলো একজনের সাথে অপরজনের ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়া। মহিলারা অপরের গীবত শেকায়েত, দোষচর্চা ও কুৎসা রটনায় খুবই অভ্যস্ত। অপরের দোষচর্চা ও কুৎসা রটনায় তারা যেমন মুখর থাকে, তেমনি অপরের কুৎসা ও দোষচর্চা শুনতেও অত্যাধিক পছন্দ করে। তাদের অভ্যাসই হলো কার কি দোষ ত্রুটি আছে তার সন্ধানে লিপ্ত থাকা।

বাইরে কোথাও থাকলে সেখান থেকে ঘরে পা রাখা মাত্রই এ অনুসন্ধানে লেগে যায় যে, কে তার সম্পর্কে কি বলেছে ? যেন সে এরই অপেক্ষায় ছিলো। কেউ তার সম্পর্কে কোন কিছু বলেছে– এমন কিছু যদি শুনতে পায়, তখন তাকে আর বাধা দিয়ে রাখে কে ? তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে ঝগড়ায় নেমে গেলো আর কি।

মনে রাখা উচিত, অপরের গীবত, দোষ-চর্চা ও কুৎসা রটনার দ্বারা অনৈক্য ও বিশৃংখলাই শুধু সৃষ্টি হয়, পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার আগুনই শুধু জ্বলে উঠে। তাছাড়া অপরের গীবত ও দোষচর্চা করা ও শোনা একটি জঘন্য পাপ। পবিত্র কুরআনে গীবত সম্পর্কে কঠোর নিন্দাবাদ ঘোষিত হয়েছে।

মহিলাদের একটি বদ অভ্যাস

নারীর অভ্যাস হলো, অতি নগণ্য কোন বাহানা পেয়ে গেলে তা যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে এবং তার শাখা-প্রশাখা বের করে তা সঞ্জীবিত করে রাখার চেষ্টা করবে। ফলে তার অন্তরে পুঞ্জীভূত দুঃখ ও ক্ষোভ দূর না হয়ে তা বিদ্বেষে পরিণত হয়ে তার আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। এমন কোন পরিবার নেই, যেখানে মহিলারা এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত আছে। মা-মেয়ের সংঘাত, শাশুড়ী-বউয়ের সংঘাত মূলত এ কারণেই হয়ে থাকে। আর স্বামীর বোনদের তো কাজই হলো ভাবীর দোষ-ত্রুটি খুঁটে খুঁটে বের করে তার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া।

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, প্রতিটি পরিবারে মহিলাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও সংঘাত-সংঘর্ষের মূল উৎস হলো, একজনের প্রতি অপরজনের অহেতুক ও ভিত্তিহীন সন্দেহ সংশয়। কারো সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ হওয়া মাত্র তার সত্যাসত্য যাচাই না করে ঝগড়া ও সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া মহিলাদের একটি সাধারণ অভ্যাস।

ঘরে-ঘরে, পরিবারে-পরিবারে এ ধরনের ভিত্তিহীন সন্দেহ-সংশয় ও কথা-বার্তা নিয়েই যত সব ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়। কোন আল্লাহর বান্দার এতটুকু সুযোগ হয় না যে, নিজের সম্পর্কে কোন কটূক্তি কানে আসার পর মাঝখানের বর্ণনাকারী সূত্রটি বাদ দিয়ে সরাসরি কটূক্তিকারিনীকে জিজ্ঞাসা করে নেয়া যে, তুমি কি আমার সম্পর্কে এ ধরনের কোন কটূক্তি করেছো ?

ইসলামের বিধান তো হলো, যদি তুমি শুনতে পাও, কেউ তোমার কোন গীবত, দোষচর্চা বা কটূক্তি করেছে, তখন তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে নেয়া উচিত যে, তোমার পক্ষ হতে আমার বিরুদ্ধে আমার কানে এমন এমন কথা পৌঁছেছে। তখন উক্ত ব্যক্তিই তার যথার্থ জবাব দেবে। কথাটি যদি অবান্তর হয়ে থাকে, তাহলে আপোষের ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয়ে যাবে।

শোনা কথার উপর নির্ভর করে তার ভিত্তিতে হুকুম লাগিয়ে দেয়া কুরআনুল কারীমের নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا" (سورة الحجرات ـ اية ـ ١٧)

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ্। আর তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে তার দোষচর্চা না করে।" (সূরা-হুজুরাত, আয়াত- ১২)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ"

"অহেতুক ধারণা হতে তোমরা নিজেদেরকে বিরত রাখো। কেননা অহেতুক ধারণা নিকৃষ্টতম মিথ্যা।"

আমার (হযরত থানবী রঃ) গোটা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শোনা কথা কদাচিৎই সত্য হয়ে থাকে। জনৈক জ্ঞানীর কথা, যে সব ঘটনার সাথে বর্ণনাকারীর কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই এবং বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা প্রশ্নাতীত, সে সব ঘটনাও তদন্ত করলে দেখা যাবে, বর্ণিত ঘটনাসমূহের এক চতুর্থাংশও সত্য নয়। অতএব, যে সমস্ত ঘটনার সাথে বর্ণনাকারীর স্বার্থের সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলো মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়?

পারিবারিক ঝগড়া-কলহ ও সংঘাত-হানাহানি যেখানেই হচ্ছে, তার একমাত্র কারণ এ জাতীয় অসৎ নারীদের ভিত্তিহীন বর্ণনা ও কথা-বার্তা। এরা অপরের কাছ থেকে সামান্য কিছু শুনে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো কিছু যুক্ত করে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বর্ণনা করে। ফলে শ্রবণকারী নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয় যে, অমুক আমার বিরোধিতায় তৎপর। অতঃপর উক্ত অহেতুক ধারণাপ্রসূত কথার সাথে সে নিজে আরো কিছু মাত্রা যুক্ত করে নেয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক কলহ ও সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়।

এর দৃষ্টান্ত যেমন, এক ব্যক্তি রাতে গভীর অরণ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলো এবং তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে এ আশংকা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলো। অতঃপর সে বনের মধ্যে কোন একদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দূরের একটি গাছকে সে বাঘ কল্পনা করলো। অতঃপর উক্ত কল্পনা আরো সুদৃঢ় হয়ে কাল্পনিক বাঘের হাত-পা, মাথা পরিদৃষ্ট হতে লাগলো এবং তার কাছে তা বাস্তব বাঘে পরিণত হয়ে সে বাঘ আতংকে চিৎকার জুড়ে দিলো। অথচ বাস্তবে এখানে একটি গাছ ছাড়া কিছুই নেই। সবই তার চিন্তা ও কল্পনার ছবি মাত্র।

অনুরূপ মহিলারা যখন কোন কিছু শুনতে পায়, তখন তাতে নিজের পক্ষ হতে আরো নতুন নতুন সংযোজনের চেষ্টায় লেগে যায়। প্রথমত কিছু সংযোজন হয় বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে। অতঃপর যার কাছে বর্ণনা করা হলো, সে যেহেতু পূর্ব থেকেই সুযোগের সন্ধানে থাকে, তাই এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে পূর্বের সমস্ত কথাকে পুনরুজ্জীবিত করে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত এ কথাসমূহকে বাস্তবে রূপ দেয়। ফলে পারস্পরিক ঝগড়া সৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়।

মহিলাদের তো স্বচক্ষে দেখা কথা-বার্তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। অধিকাংশ মহিলা নিজের ননদ ও ভাসুরদের যে কোন কাজকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে গাল ফুলিয়ে রাখে। অতঃপর যখন তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, "তুমি যে বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে আছো, তা এরূপ নয়। তুমি ভুল ধারণা করেছো।" তখন সে বলে, "আমি কি শিশু ? কিছুই কি বুঝি না ? অমুক কাজ আমাকে উত্ত্যক্ত করার জন্যই করা হয়েছে।" তাকে হাজারো বুঝানো হোক না কেন, তার মাথায় একবার যা ঢুকেছে, তা তার মাথা হতে বের করার সাধ্য কারো থাকে না। অতঃপর এ কাল্পনিক কারণকে পুঁজি করে তার জিদের উপর জিদ চলতে থাকে এবং সামান্য বাহানাতেই নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অতঃপর উভয়পক্ষ হতে শুরু হবে নিন্দা, দোষচর্চা ও কুৎসা রটনা। এবং একজন অপরজনের দোষ তালাশে এবং একজন অপরজনকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনই কসুর করবে না। এ সবই ক্রোধ ও উত্তেজনার অশুভ পরিণতি। ক্রোধ ও উত্তেজনার কাছে মহিলারা পরাস্ত হয়ে যায়।

দেবর ও এতীম ভাই-বোনের প্রতি ভাবীর নির্যাতন

অনেক সময় দেখা যায়, পরিবার প্রধান মৃত্যুবরণ করার সময় বড় ছেলে-মেয়েদের সাথে ছোট না-বালেগ সন্তানও রেখে যায়। যাদের প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় বড় ভাইদের উপর। বড় ভাইয়ের সূত্রে তাদের উপর ভাবীরও কর্তৃত্ব এসে যায়। ছোটদেরকে যেহেতু একই ঘরে থাকতে হয়, এ সুবাদে তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণত মহিলাদের হাতেই থাকে। বড় ভাই বাইরে থাকার সুযোগে তাদের প্রতি ভাবীর বিদ্বেষ ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কারণে অকারণে তাদের উপর চলতে থাকে দৈহিক নির্যাতন ও অকথ্য গালাগাল। তাদেরকে পেট ভরে খাবার না দেয়া, তাদের কাপড়-চোপড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খবর না রাখা, তাদের সাথে চাকর-চাকরানীর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করা ইত্যাদি বর্তমান যুগের ভাবীদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এরা তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালিয়েও স্বস্তি বোধ করে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা তাদের বড় ভাইয়ের কান ভারী করতে

থাকে। মোটকথা, ভাবীর পক্ষ হতে এ অসহায় এতীমদের উপর এমন অমানবিক নির্যাতন চলতে থাকে, যা কল্পনা করলে গা শিউরে উঠে।

আমি পুরুষদেরকেও বলছি। অসহায় এতীমদের প্রতি নিজেও যত্নবান হবে। তাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবে না। স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে স্ত্রী কোন অভিযোগ করলে তা সুনিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয়ার মত কোন কারণ নেই। কারণ, একথা সুপ্রমাণিত যে, ভাবী দেবরদেরকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করে তাদের উপর শত্রুতা উদ্ধারে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের কি বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে!

আমি তো বলি, এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষের উচিত স্ত্রীকে শুনিয়ে দেয়া যে, "আমার ছোট ভাই-বোনের বিরুদ্ধে তোমার সত্য অভিযোগও আমার কাছে মিথ্যা হিসাবে গণ্য হবে।" অবশ্য আমার (হযরত থানবী (র)) এ কথাগুলো সকল পুরুষদের ক্ষেত্রে নয়। অনেক পুরুষ তো এমন আছে, যারা সত্যিকার অর্থেই পুরুষ। যারা এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ ধৈর্য, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। যারা এতীম ভাই-বোনদের ভাবীর সাথে সহ অবস্থানকে নেকড়ে-বকরীর সহ অবস্থানের ন্যায় মনে করে। কারণ, নেকড়ে ও বকরী এক জায়গায় অবস্থান করলে নেকড়ের দিক হতে বকরীর উপর আক্রমণ হবেই। এমন মনে করার কোনই কারণ নেই যে, নেকড়ে বকরীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে তাকে ছেড়ে দিবে।

স্ত্রীর কথায় পড়ে ছোট এতীম ভাই-বোনদেরকে কষ্ট দেয়া চরম অন্যায়। জনৈক জ্ঞানী যথার্থই বলেছেন যে, "এতীম ছেলে-মেয়েরা তো জীবিতদের অন্তর্ভুক্তই নয়। আপন মা-বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে তারাও মৃত হয়ে গেছে।" সুতরাং মৃতকে আঘাত করা কি কোন বাহাদুরীর কাজ? তাদের প্রতি যদি সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, তবুও তাদের মৃত প্রাণ জীবনের স্পন্দন অনুভব করবে না। দু'টি শিশুকে মুখোমুখী বসাও, যাদের একটি এতীম এবং অপরটি এতীম নয়। অতঃপর তাদের সামনে যে কোন একটি বস্তু রেখে বলে দেখো, যে আগে উঠিয়ে নিবে, জিনিসটি তাকে দেবো। পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, এতীমের হাত উক্ত বস্তুর প্রতি ধাবিত হবে না। কারণ এটাই যে, তার অন্তরে প্রাণের স্পন্দন নেই।

পারিবারিক ঝগড়া হতে আত্মরক্ষার উপায়

এক. স্বামীর উচিত স্ত্রীর কথার উপর নির্ভর না করা এবং স্ত্রীরও উচিত স্বামীর কাছে এমন কোন কথা না বলা, যা শুনে স্বামী উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে।

দুই. যখন পরিবারের কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ শুনবে, তখন মনে করে নিবে, অভিযোগকারী একটি সত্যের সাথে দশটি মিথ্যার সংযোগ ঘটিয়েছে।

যদি বিষয়টি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে, তাহলে তার প্রতিবিধান করতে চাইলে একটি অন্যায় কাজের প্রতিবিধান করতে একটি অন্যায় দ্বারা। অথচ অপরের থেকে শোনা কথার উপর নির্ভর করে এখন তোমাকে একটি অন্যায়ের বিনিময়ে দশটি অন্যায় করতে হবে। তাহলে ব্যাপারটি এমন হলো যে, কেউ তোমার এক পয়সা ক্ষতি করলো, বিনিময়ে তুমি তার দশ পয়সা ক্ষতি করে বসলে। অতঃপর যখন তা আদালতে যাবে, তখন দেখা যাবে, এক পয়সার ক্ষতির বিনিময়ে তার দশ পয়সা ক্ষতি করার কারণে উল্টো তুমিই আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছ।

যেমন কারো সম্পর্কে শুনলে যে, সে তোমার কোন একটি দোষচর্চা করেছে। তখন তুমিও তার একটি দোষচর্চা করে প্রতিশোধ নিয়ে নিলে। এটা তো বিনিময় হয়ে গেলো। এখানে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, সম্পূর্ণ সমান সমান প্রতিশোধ হয়ে গেছে, তাহলে সেটা হবে পরিমাণের দিক থেকে সমান। কারণ, প্রতিপক্ষের একটি দোষচর্চার বিনিময়ে তুমিও একটি দোষচর্চা করলে। কিন্তু এ কথার কি নিশ্চয়তা আছে যে, তোমার এ প্রতিশোধ গ্রহণ গুণগত দিক থেকে অধিক হবে না, কিংবা ভবিষ্যতে আধিক্য লাভ করবে না? সাধারণত দেখা যায় , কারো সম্পর্কে অন্তরে একবার খারাপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেলে তার প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ করেও মানুষ স্বস্তি পায় না। বরং পূর্বানুরূপ খারাপ ধারণা তার অন্তরে থেকেই যায়। উপরন্তু তা থেকে জন্ম নেয় বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। যা গুণগত দিক থেকে দোষচর্চার তুলনায় অনেক অনেক বেশি নিকৃষ্ট। হিংসা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে– "হিংসা নেক আমলসমূহকে এমন ভাবে নিঃশেষ করে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ফেলে।"

সুতরাং প্রতিপক্ষের দোষচর্চার বিনিময়ে তোমার অন্তরে যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো, তা তো গুণগত দিক থেকে অনেক অনেকগুণ বেশি জঘন্য। কেননা তা তোমার যাবতীয় নেক আমলসমূহকে নিঃশেষ করে ফেলবে। পক্ষান্তরে দোষ চর্চাকারীর অবস্থা তো এরূপ নয়। এখানে অবশ্যই বিবেক খরচ করে কাজ করা উচিত। নফস্ ও প্রবৃত্তির বিপরীত চিন্তা করা উচিত। কারণ, যদি একটি গীবত ও দোষচর্চার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমার অন্তরে দোষচর্চাকারীর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ বাসা বেঁধে বসে, তাহলে তা তোমার জন্য কেমন দুর্ভাগ্যজনক হবে!

পারিবারিক ঝগড়া-কলহ থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি সহজ উপায় হলো, একাধিক পরিবার বা একাধিক ব্যক্তি একই বাড়ীতে একসাথে না থাকা।

একাধিক মহিলা একসাথে থাকার ফলেই যতসব ঝগড়া-কলহ ও ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

মহিলাদের জন্য একটি জরুরী উপদেশ

পিত্রালয়ে গিয়ে কিছুতেই স্বামীর বাড়ির দুর্ণাম করবে না। এমনকি চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও নয়। কেননা এমন অনেক দুর্ণাম আছে, যার কারণে গুনাহ্ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। স্বামীর বাড়ীর দুর্ণাম করা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচায়ক নয়। এর কারণেই অধিকাংশ সময় উভয় পক্ষে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

অনুরূপ স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে নিজের পিত্রালয়ের প্রশংসা করা কিংবা তা নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। অযথা পিত্রালয়ের পক্ষপাতিত্বও করতে যাবে না। এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নিজেই হবে। তাছাড়া এটা সুস্পষ্ট অহংকার। আল্লাহ অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না। উপরন্তু স্বামীর বাড়ীর সকলে বলবে, মহিলাটি তার স্বামীকে ও আমাদেরকে তুচ্ছ মনে করে। ফলে তাদের কাছে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না। হাদীস শরীফে আছে ঃ

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ

"যে মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।"

স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ না তুমি স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তোমার কোন ইবাদত কবুল করবেন না। আল্লাহ্ চান, তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার মাধ্যমে তোমাকে কোন নে'আমত দান করেন, তখন তুমি যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে উক্ত বান্দারও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

আল্লাহর এমন অনেক বান্দীও আছে যারা স্বামীর ছোট বড় যে কোন জিনিসকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে। স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সদা সচেষ্ট থাকে। তার সামনে অবনত শির হয়ে থাকাকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে।

অষ্টম অধ্যায়

গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম স্ত্রীর দায়িত্বে

গৃহের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব স্ত্রীর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ .

"স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল। তাদের সম্পর্কে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।"

অনেক মহিলা গৃহের কাজ-কর্ম করাকে নিজের জন্য অপমানের বিষয় মনে করে। ঘরের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করে। হাদীসে আছে, স্ত্রীরা হলো ঘরের দায়িত্বশীল। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। ঘরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে ঘর নষ্ট হতে থাকে। ঘরের আসবাবপত্র চুরি হয়। ঘরের প্রতি খুবই যত্নবান হওয়া আবশ্যক। ঘর অপরের উপর ছেড়ে দেয়া কখনও সমীচীন নয়।

সাধারণত মহিলারা মনে করে, তাদের দায়িত্ব শুধু খাবার পাকানো, রাতে বিছানা বিছানো, স্বামীর কাপড়-চোপড় ধোপার নিকট হিসাব করে দেয়া, হিসাব করে নেয়া এবং তা সযত্নে বাক্সে রেখে দেয়া।

ঘরের অন্যান্য কাজ কর্মকে তারা নিজেদের দায়িত্বই মনে করে না। তাদের দায়িত্ব যেন শুধু স্বামীকে খাবার প্রস্তুত করে দেয়া, ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে তাদেরকে পায়খানা পেশাব করানো। আর এটাও তখন, যদি ছোট ছেলে-মেয়ে রাখার জন্য ঘরে চাকর-বাকর না থাকে এবং তার উপর বাধ্যবাধকতা থাকে। অন্যথায় এ খবরও রাখতে রাজী নয় যে, বাচ্চা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কি খেয়েছে না খেয়েছে। আর যদি খাবার পাকানোর চাকরানী থাকে, তাহলে আর তাদেরকে দেখে কে? তখন তারা চুলার খবরও রাখে না। ফলে চাকরাণী হয়ে যায় ঘরের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী। সে যা খুশী তা-ই করে। কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করার থাকে না। মোটকথা, স্বামীর কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা ও আসবাবপত্রের প্রতি মহিলাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না।

গৃহের কাজ করাও ইবাদত

অনেক মহিলা দ্বীনদারী গ্রহণ করতে গিয়ে ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম চাকর-চাকরাণীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে তাসবীহ্ ও জায়নামাজ নিয়ে বসে যায়। এটা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা ঘরের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং স্বামীর সম্পদ ও আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা স্ত্রীর উপর ফরজ। স্ত্রী যদি তাসবীহ্ ও জায়নামাজ নিয়ে বসে থাকে, তাহলে উক্ত ফরজ আদায়ে ব্যাঘাত ঘটবেই। ফরজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে নফল ইবাদত ও তাসবীহ্ পাঠের কি মূল্য থাকতে পারে? দ্বীনদারী করবে ভালো কথা। কিন্তু তা করতে গিয়ে ঘরের কোন খোঁজ-খবরই না রাখা সীমালংঘন ছাড়া আর কি হতে পারে? নফল নামাজ, নফল রোজা ও তাসবীহ্ পাঠ ইত্যাদি যদি করতে হয়, তাহলে তা এমনভাবে করা উচিত যেন ঘরের দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। গৃহের দায়িত্ব পালন করাও দ্বীনের কাজ এবং তাতেও সাওয়াব কোন অংশে কম নয়। তবে শর্ত হলো, যদি এ নিয়তে করা হয় যে, ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা আল্লাহ আমার উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন, আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করছি। তবে গৃহের কাজ-কর্মে এমন নিমগ্নও হবে না যে, দ্বীনের প্রত্যক্ষ হুকুম-আহ্কাম পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সব কিছুর মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত।

আল্লাহ আল্লাহ জিকির করা তো গৃহের কাজ-কর্ম করা অবস্থায়ও হতে পারে। এমন কী প্রয়োজন যে, আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে হলে তাসবীহ্ ও জায়নামাজ নিয়ে বসতে হবে? হাদীস শরীফে আছে ঃ

"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ"

"তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা সতেজ থাকে"

অথচ তাসবীহ্ ও জায়নামাজ তো সর্বদা সাথে রাখা সম্ভব নয়। তাহলে বুঝা গেলো, আল্লাহর জিকিরের জন্য তাসবীহ, জায়নামাজ কিংবা অন্য কিছু থাকা শর্ত নয়। বরং যে কোন সময় যে কোন অবস্থায়ই তা করা যেতে পারে।

অনেকে মনে করতে পারে, নিয়তের কারণে দুনিয়াও যখন দ্বীন হয়ে যায়, তাহলে আর নামাজ-রোজা ও ইবাদত-বন্দেগীর কি প্রয়োজন? স্বামীর জন্য খাবার পাকানো, গৃহের কাজ-কর্ম করাই তো যথেষ্ট। কারণ, সঠিক নিয়তের কারণে এগুলোই তো দ্বীন হিসাবে গণ্য। এর জবাব হলো, উল্লিখিত কাজসমূহ এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীন হলেও সত্ত্বাগতভাবে দ্বীন নয়। অথচ নামাজ, রোজা ইত্যাদি সত্ত্বাগতভাবেই দ্বীন। দ্বীনের অংশ হিসাবেই সেগুলো শরীয়ত

কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। অতএব, পারিবারিক কাজ-কর্ম কখনও নামাজ, রোজা ইত্যাদির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।

অনেক মহিলা এটাকেই বড় ইবাদত ও বুযুর্গী মনে করে যে, সে গৃহের যাবতীয় কাজ-কর্ম করছে, স্বামীর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করছে, সন্তানের প্রতিপালন করছে এবং গৃহের আভ্যন্তরীণ সকল দায়িত্ব পালন করছে। সুতরাং তার আর অন্য কিছু করার প্রয়োজন কি ? এ ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা করা নিছক মূর্খতা বই কিছু নয়।

মনে রাখবে, নামাজ, রোজা ইত্যাদি আপন সত্ত্বাগতভাবেই দ্বীনের মৌলিক অংশ এবং দ্বীন হিসাবেই তা শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত। পক্ষান্তরে গৃহের কাজসমূহ সত্ত্বাগতভাবে দ্বীন নয়; বরং দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত তার আনুষঙ্গিক বিষয়। অতএব, তা কখনও দ্বীনের মৌলিক অংশসমূহের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কোথায় নামাজ-রোজা আর কোথায় গৃহস্থালী কাজ কর্ম ?

প্রশ্ন হতে পারে, নিয়তের অর্থ কি? যার কারণে পারিবারিক কাজ-কর্ম সমূহ দ্বীনের অংশে পরিণত হয়ে যায় ? নিয়তের অর্থ হলো, স্ত্রী স্বামীর জন্য যা কিছু করবে– যেমন খাবার পাকানো, স্বামীর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা, সন্তানের প্রতিপালন করা ইত্যাদি– সব এ নিয়তে করবে যে, দ্বীন ও শরীয়ত স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, সে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে। ফলে তার দুনিয়াবী কাজসমূহও দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হয়ে যাবে।

চাকরানী থাকা সত্ত্বেও নিজে কাজ করা উচিত

আল্লাহ তা'আলা যাকে চাকরানী রাখার তাওফীক দিয়েছেন, তারও উচিত সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে বসে না থেকে পরিবারের কিছু কিছু কাজ করা। এটা মোটেই শোভনীয় নয় যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা পালংয়ের উপর গড়াগড়ি করবে এবং কোন কাজে হাতও স্পর্শ করাবে না। কেননা এর ফলে অলসতা চেপে বসবে, কাজের অভ্যাস ছুটে যাবে এবং পরমুখাপেক্ষী হতে অভ্যস্ত হবে। নিয়মিত কিছু কিছু কাজ করলে অলসতা চেপে বসবে না, কাজের অভ্যাসও থেকে যাবে, সর্বোপরি স্বাস্থ্যও অটুট থাকবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ

"শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চেয়ে উত্তম।"

সাহস ও মনোবলের দাবী তো এটাই যে, গৃহের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদনে নিজে সম্পূর্ণ সচেতন থাকবে। চাকর-চাকরানী থাকলে তাদেরকে দিয়ে

নিজ তত্ত্বাবধানে কাজ করাবে। কিছু কিছু কাজ নিজ হাতে করবে। প্রাত্যহিক কিছু সময় নির্ধারণ করে রাখবে নফল ইবাদত, জিকির-আজকার ও আপন প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করার জন্য। পারিবারিক অতিরিক্ত কাজের চাপে যদি পৃথক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও কাজ-কর্মের মধ্যেই আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে।

নিজ হাতে কাজ করলে নিজেরই ফায়দা। যেমন– খাবার পাকানো; তরি-তরকারী কাটা, মশলা পেষা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, সন্তান লালন-পালন করা ইত্যাদি। এর দ্বারা স্বাস্থ্য অটুট থাকে, রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ! আমার পরিবারে ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম আমার স্ত্রী নিজ হাতে করে। কোন কাজে কারো উপর নির্ভর করে থাকে না। বড় কোন ঝামেলাপূর্ণ কাজ করলে হয়তবা কিছু বখশিশ্ দাবী করে। তবে স্ত্রী যদি পরিবারের কঠিন কোন কাজও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সানন্দে করে ফেলে, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু নিপীড়নমূলক শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর কঠিন কোন কাজ চাপিয়ে দেয়া চরম নির্দয়তা।

মহিলারা এমনিতেই সব সময় গৃহে আবদ্ধ থাকে। তাই প্রাত্যহিক নিয়মিত কিছু শারীরিক পরিশ্রম যদি না করে, তাহলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। শরীরে মেদ-ভুঁড়ি জমে যাবে। বহুমুখী রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং নিয়মিত ডাক্তার-কবিরাজ ও ঔষধ-পথ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সমাজে এখনও নিজে পরিশ্রম করার নিয়ম চালু আছে, সেখানে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো, বিভিন্নমুখী রোগ-ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত নয়। তাদেরকে চিকিৎসকের অতিরিক্ত শরণাপন্ন হতে হয় না। আল্লাহ তা'আলা সে সব নারীকে সঠিক বুঝ দান করুন, যারা আপন গৃহের কাজ কর্মে হাত গুটিয়ে অপরের উপর নির্ভর করে বসে থাকে। কারণ, এর দ্বারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হলো। দ্বীন তো নষ্ট হলো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন না করার কারণে এবং দুনিয়া নষ্ট হলো স্বাস্থ্যের ন্যায় মহা সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে।

অধিকাংশ মহিলাকে দেখা যায়, ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় রক্ষণাবেক্ষণেও চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়। ঘরের কাপড়-চোপড় ধোপাকে দেয়ার সময় গুণে দেয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজী নয়। ধোপার বিশ্বস্ততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাকে দেয়ার সময় হিসাব করে দেয় না এবং তার থেকে নেয়ার সময় হিসাব করে নেয় না। ফলে কাপড় দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে ধোপা যা ইচ্ছা তাই করে।

আর যে সব মহিলা ঘরের জিনিসপত্র ও কাপড়-চোপড়ের প্রতি যত্নবান, তারা ধোপাকে কাপড় দেয়া নেয়ার সময় হিসাব রাখলেও ঘরের বাইরে দেয়ালের

কোথায়ও কয়লা দ্বারা দাগ কেটে কাপড়ের সংখ্যা লিখে রাখাকেই যথেষ্ট মনে করে। আমার জানামতে এক বাড়ীতে কয়লা দ্বারা এরূপ দাগ কাটার কারণে সম্পূর্ণ দেয়াল কালো হয়ে গিয়েছিলো। দেয়ালের এ দাগের কি নির্ভরযোগ্যতা আছে ? সামান্য হাত লাগলে তা মুছে যেতে পারে। কিংবা দু'একটি দাগ ধোপা সন্তর্পণে কমাতে বাড়াতেও পারে। ফলে ধোপা যা দাবী করবে, সে পরিমাণ কাপড়েরই পারশ্রমিক দিতে হবে। কখনও কখনও দেখা যায়, কাপড়ের সংখ্যা নিয়ে ধোপার সাথে বিরোধও বেধে যায়। ধোপা একসংখ্যা বলে আর কাপড়ওয়ালা অন্য সংখ্যা বলে। অথচ কারো কাছেই সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। ফলে অগত্যা ধোপার দাবীকৃত সংখ্যারই পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এজন্য নিরাপদ ব্যবস্থা হলো, নিজের কাছে সংরক্ষিত কাগজে বা খাতায় কাপড়ের সংখ্যা লিখে রাখা। তাহলে কম বেশি হওয়ার আশংকা থাকবে না। বর্তমানে এ সব বিষয়ের প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না। এর কারণ একটিই। তা হলো, মহিলারা এ সকল কাজকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে না।

মু'আমালায় স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা

মু'আমালা ও লেনদেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই জরুরী বিষয়। পবিত্র কুরআনে ছোট বড় যে কোন লেনদেন লিখে রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরে কোন লেনদেন করবে, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো।"

অথচ বর্তমান সমাজে এটাকে বড় সংকীর্ণতা মনে করা হয়। ফলে অনেক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিকে দেখা যায়, সে কোন্ জিনিস কাকে দিয়েছে তা তার খবরই থাকে না। পরে জিনিসটি না পাওয়া গেলে তখন তার পেরেশানীর অন্ত থাকে না।

এজন্য লেনদেন যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত। লেনদেন লিখে রাখার উপকারিতা অনেক। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ সংশয় ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে না। যে কোন লেনদেন লিপিবদ্ধ করে রাখা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। যখন কাউকে করজ দিবে বা কারো থেকে করজ নিবে কিংবা করজ পরিশোধ করবে, তখন সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

যেমন ধোপাকে কাপড় দেয়ার সময় তার উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখার উপকারিতা হলো পরবর্তীতে কোন পক্ষ থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা।

এর আরেকটি ফায়দা এই যে, ঘটনাক্রমে লিপিবদ্ধ করে রাখা কাগজ হারিয়ে গেলেও উক্ত কাগজের একটি প্রভাব ধোপার উপর অবশ্যই থাকবে। ফলে সে কাপড়ের সংখ্যা যথাযথভাবে ফেরৎ দিতে ভুল করবে না।

হিসাব-নিকাশ ও লেখা-পড়ার যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহকে মূল্যায়ণ করা উচিত। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও মৌখিক হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করবে না। বরং জরুরী বিষয়সমূহ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

খাবার পাকানো স্ত্রীর দায়িত্ব নয়

আমার পরিচিত জনৈক মাওলানা সাহেব বলতেন, খাবার পাকানো স্ত্রীর দায়িত্ব। আমার মতে স্বামীর জন্য খাবার পাকিয়ে দেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত দলিলরূপে পেশ করা যায়। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

"তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সংগিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও অনুগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা-রূম, আয়াত – ২১)

অর্থাৎ, নারী জাতিকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তোমাদের অন্তর স্বস্তি ও শান্তি লাভ করবে, তোমরা আত্ম প্রশান্তি ও সুখ-আনন্দ লাভ করবে। সুতরাং নারীরা মনের সুখ ও আনন্দ লাভ করার জন্য; খাবার পাকানো, রান্নাঘরের কাজ করার জন্য নয়।

তবে নৈতিক বিচারে খাবার পাকানোর কাজটি স্ত্রীকেই সম্পাদন করা উচিত। স্বামী যদি খাবার পাকানোর আদেশ করে, তাহলে তার আদেশ পালন করা নৈতিকভাবে স্ত্রীর উপর আবশ্যক হয়ে যায়।

কেননা হাদীসে আছে , "স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্দেশ দেয় এই কালো পাহাড়ের পাথরসমূহ ঐ সাদা পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার এবং ঐ সাদা পাহাড়ের পাথরসমূহ এই কালো পাহাড়ে নিয়ে আসার, তাহলে স্ত্রীর উপর তা ওয়াজিব হয়ে যায়।" স্বামীর আদেশ পালন করার প্রতি যখন হাদীসে এরূপ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তাহলে খাবার পাকানোর আদেশ পালন আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়?

নবম অধ্যায়
স্ত্রীর হকের (অধিকার) বর্ণনা

মহান আল্লাহ যখন স্বামীর উপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কার আছে ? আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত স্ত্রীর এ অধিকার স্বামী আদায় না করলে তাকে অবশ্যই পরকালে বান্দার হক নষ্ট করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। পবিত্র কুরআনে কত সুন্দর ভাষায় নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে বলা হয়েছে ঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ـ

"স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তাহলে হয়ত তোমরা এমন এক বস্তুকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা, আয়াত – ১৯)

স্ত্রীকে পছন্দ না হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোন কারণ থাকবে। স্ত্রীর আখলাক ও চরিত্র সুন্দর না হওয়াই পছন্দ না হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। স্ত্রী সুন্দর ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হলে স্বামীর জন্য তা খুবই কষ্টকর হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, স্ত্রীর অসুন্দর চরিত্রকে তিনি কল্যাণ লাভের কারণে পরিণত করবেন। আল্লাহ মহাশক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা তিনি করতে সক্ষম নন। অসৎ চরিত্রের স্ত্রীর গর্ভে তিনি এমন নেক সন্তান দান করতে পারেন, যে কিয়ামত দিবসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে।

স্ত্রীর হক বা অধিকারসমূহ ঃ

এক. স্ত্রীর সাথে মহৎ চরিত্রের পরিচয় দেয়া। আচরণ-উচ্চারণ, চলা-ফেরা, উঠা-বসা তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সাথে সুন্দর আচরণ করা।

দুই. স্ত্রীর পক্ষ হতে কষ্টদায়ক কোন আচরণ পেলে তা সহ্য করে নেয়া। তবে তাতে অবশ্যই ভারসাম্য থাকা আবশ্যক।

তিন. স্ত্রী সম্পর্কে অহেতুক ও অশোভনীয় ধারণা পোষণ না করা। আবার সম্পূর্ণ উদাসীনও না থাকা।

চার. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ, খরচে মাত্রাতিরিক্ত সংকোচনও না করা, আবার অযথা খরচেরও সুযোগ না দেয়া।

পাঁচ. হায়েয, নিফাস ইত্যাদির প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ নিজে শিক্ষা করে স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া। তার নামাজ, রোজা ও ধার্মিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া এবং কুসংস্কার ও না-জায়েয কাজ থেকে তাকে বিরত রাখা।

ছয়. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের হক আদায়ে সমতা রক্ষা করা।

সাত. স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী তার সাথে সহবাস করা।

আট. স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তার যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত না ঘটানো।

নয়. বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

দশ. স্ত্রীর রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়-স্বজন যেমন, মা-বাবা, চাচা-ফুফু, মামা-খালা, ভাই-বোন সকলের সাথে তাকে মিলিত হতে দেয়া।

এগার. স্ত্রী মিলন ও তার আনুষাঙ্গিক গোপন ক্রিয়া-কর্ম কারো কাছে প্রকাশ না করা।

বার. স্ত্রীকে সীমার অতিরিক্ত প্রহার না করা।

তের. একান্ত অনন্যোপায় হওয়া ব্যতীত স্ত্রীকে তালাক না দেয়া।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব কেন?

ফিকাহবিদগণের মতে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ হলো তাকে আবদ্ধ করে রাখার বিনিময়। কারণ, ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, যদি কেউ কারো উপকার বা কল্যাণের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায় এবং এজন্য তার জীবিকা অর্জনের কোন সুযোগ না থাকে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর, যার স্বার্থে সে আবদ্ধ হয়েছে। এখানে যেহেতু স্বামী কর্তৃক আবদ্ধ হওয়ার কারণে স্ত্রীর জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই তার ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীর উপর অর্পিত হয়।

যেমন সাক্ষ্যদাতাদের খোরাকীর দায়িত্ব তাকে বহন করতে হয়, যার অনুকূলে তারা সাক্ষ্য দিবে। কারণ, সাক্ষ্য প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তদানীন্তন মুসলিম শাসকগণ ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটির উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করেছেন। উল্লিখিত যুক্তির ভিত্তিতেই ইসলামী আইন বিশারদগণ স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও

যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তখন আবশ্যক, যদি স্ত্রী নিজেকে পরিপূর্ণরূপে স্বামীর কাছে অর্পণ করে। তবে শরীয়ত স্বীকৃত কোন কারণে নিজেকে অর্পণ করা থেকে বিরত থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। যেমন, মহরে মুআজ্জাল (নগদ পরিশোধযোগ্য মহরের অংশ) আদায়ের শর্তে স্ত্রী নিজেকে অর্পণ করতে অস্বীকার করলো। এমতাবস্থায় তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর বহাল থাকবে। কারণ, এখানে ত্রুটি স্বামীর, স্ত্রীর নয়।

তবে স্ত্রী যদি অবাধ্যতা বা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে যতক্ষণ না সে স্বামীর গৃহে ফিরে আসবে, তার ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকবে না।

অনেক নারী স্বামীর কথা অমান্য করে পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে এবং সেখানে থাকা অবস্থায় স্বামীর কাছে ভরণ-পোষণ দাবী করে। তাদের এ দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ভরণ-পোষণ পাওয়ার জন্য স্বামীর গৃহে অবস্থান করা পূর্বশর্ত।

না-বালেগ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ

স্ত্রী যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কারণে সহবাসের অনুপযোগী হয়; কিন্তু স্বামীর কাছে থাকলে স্বামী আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি পায় এবং সে স্বামীর সাধারণ খিদমত করতে সক্ষম, তাহলেও তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব। তবে যদি স্বামীকে আনন্দ দান ও তার সাধারণ খিদমতেরও উপযোগী না হয়, তাহলে তার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকবে না। কোন কোন সমাজে মেয়েদেরকে শৈশবে বিবাহ দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হবে না।

স্ত্রী যদি সহবাসের অনুপযোগী হয়; কিন্তু স্বামীকে আনন্দ দান ও তার সাধারণ খিদমত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে নিজ আয়ত্তে এনে তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে স্বামী বাধ্য নয়। বরং আয়ত্তে আনা না আনা সম্পূর্ণ তার ইখতিয়ারে থাকবে। যদি সেচ্ছায় নিজ আয়ত্তে এনে নিজস্ব বাসস্থানে রাখে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না।

অনেক সমাজে যুবতী মেয়েদেরকে সহবাসের অনুপযোগী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের সাথে বিয়ে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দিক থেকে যেহেতু কোন ত্রুটি নেই এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বামীর কাছে অর্পণ করে দিয়েছে। তাই তার ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর সম্পদ হতে ওয়াজিব হবে;

যদিও স্ত্রী স্বচ্ছল ও বিত্তশালী হয়ে থাকে। কারণ এখানে স্ত্রী সম্ভোগে অন্তরায় স্বামীর পক্ষ হতে সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রীর পক্ষ হতে নয়।

স্ত্রী বিত্তশালী হোক কিংবা বিত্তহীন হোক সর্বাবস্থায় তার ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব। অনেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে তখনি নিজের দায়িত্ব মনে করে, যদি স্ত্রী দরিদ্র ও বিত্তহীন হয়। স্ত্রী বিত্তশালী হলে তার ভরণ-পোষণকে নিজের দায়িত্ব মনে করে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে নিজেকে স্বামীর কাছে অর্পণ করে দেয়ার পর তার ভরণ-পোষণ উভয় অবস্থায়ই স্বামীকে বহন করতে হবে।

স্ত্রীর পৃথক বাসস্থান

স্ত্রীকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়াও তার একটি অধিকার। অধিকাংশ লোকই স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করে না। বরং নিজের মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্ত্রীকে ফেলে রাখে। ফলে স্ত্রী বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হয় এবং মুক্ত-স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে বাধা প্রাপ্ত হয়।

অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, স্ত্রী যদি পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর মা-বাবার সাথে যৌথভাবে থাকতে সম্মত থাকে, তাহলে তো ভালো কথা। আর যদি সে যৌথভাবে না থেকে পৃথক থাকতে চায়, তাহলে এটা তার ন্যায্য অধিকার। তার জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর অনিবার্য কর্তব্য।

স্ত্রী মা-বাবার সাথে থাকতে সম্মত হওয়ার অর্থ হলো, পরিপূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে এবং স্পষ্টরূপে তার সম্মতি প্রকাশ করা। বিভিন্ন আকার-ইংগিত থেকে যদি বুঝা যায় যে, পৃথক থাকাই তার কাম্য; কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করছে তাহলেও তাকে মা-বাবার সাথে রাখা জায়েয হবে না। বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও বাস্তবতার দাবী তো এটাই যে, স্ত্রী তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একসঙ্গে থাকতে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাকে পৃথক রাখাই অধিক নিরাপদ। যদিও এ কারণে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সকলে অসন্তুষ্ট হয়। কারণ, এর ফলে বহুবিধ সমস্যা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সকলে এজন্য সাময়িক কিছুদিনের জন্য মুখ ফুলিয়ে রাখলেও অচিরেই যখন এর উপকারিতা ও গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়ে যাবে।

তবে সম্পূর্ণ পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা কারো পক্ষে সম্ভব না হলে, অন্ততঃ এতটুকু করবে যে, স্ত্রীকে বড় ঘরের কোন একটি কামরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিবে। যেখানে সে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ এবং ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিসপত্র

সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে এবং স্বামীর সাথে স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা, উঠা-বসা ও কথা-বার্তা বলতে পারবে। স্ত্রীর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা কারো পক্ষে সম্ভব না হলে তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

বিশেষ কোন কারণে স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে একই ঘরে রাখতে হলেও চুলা অবশ্যই পৃথক হওয়া উচিত। কারণ, অধিকাংশ ঝগড়া-ফাসাদের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় চুলা থেকে।

অনেকে স্ত্রীকে মা-বাবার শাসনাধীন ও তাদের অনুগত করে রাখাকে নিজের জন্য বিরাট সৌভাগ্য মনে করে এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করতে থাকে। ফলে অসহায় স্ত্রী বিভিন্নভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে থাকে। স্মরণ রাখা উচিত, শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। কেউ মা-বাবার খিদমত করে সৌভাগ্যবান হতে চাইলে সে নিজে তাদের খিদমত করবে কিংবা তাদের খিদমতের জন্য লোক নিয়োগ করবে।

বিত্তশালী ও বিত্তহীন ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণ-পোষণ

স্বামী বিত্তশালী হলে তার উপর উন্নতমানের ভরণ-পোষণ এবং বিত্তহীন হলে সাধারণ মানের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। আল্লাহ যাকে যেমন তাওফীক দিয়েছেন, সে নিজের জন্য যা খরচ করতে পছন্দ করে, স্ত্রীর জন্যও তা খরচ করবে। এটাই শরীয়তের বিধান।

অনেককে দেখা যায়, নিজে পর্যাপ্ত অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর খরচের ব্যাপারে খুবই কার্পণ্য করে। স্ত্রীর খোরাকীর খরচ এত অপর্যাপ্ত দেয় যে, তাকে নিজ হাতে রান্না-বান্না করে খেতে হয়। চাকরানী বা গৃহপরিচারিকা রাখার মত সুযোগ থাকে না। অথচ স্বামী-স্বচ্ছল হলে স্ত্রীর জন্য গৃহপরিচারিকার খরচ দেয়াও তার দায়িত্ব।

তবে স্বামী-যদি অস্বচ্ছল ও বিত্তহীন হয়, তাহলে স্ত্রীর উচিত নিজ হাতে রান্না-বান্নাসহ যাবতীয় কাজ করা। অনেক মহিলাকে দেখা যায়, স্বামী অস্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাকে গৃহপরিচারিকা রাখতে বাধ্য করে। অথচ অস্বচ্ছল অবস্থায় গৃহপরিচারিকা রাখা স্বামীর জন্য আবশ্যক নয়। বরং দেখতে হবে, স্ত্রী নিজের কাজ নিজে করতে সক্ষম কিনা। যদি সক্ষম হয়, তাহলে নিজের ও স্বামীর উভয়ের খাবার পাকানো তার দায়িত্ব। আর যদি সক্ষম না হয়- চাই অসুস্থতাজনিত কারণে হোক, কিংবা বিত্তশালী পরিবারের হওয়ার কারণে হোক- তাহলেও স্বামী গৃহপরিচারিকা রাখতে বাধ্য নয় বরং স্ত্রীর জন্য তৈরি খাবার এনে দেয়া শুধু তার দায়িত্ব। চাই বাজার থেকে আনুক কিংবা অন্য কোথাও থেকে রান্না করে আনুক।

মওসুমী ফল, পান-সুপারী ইত্যাদির খরচ

অনেক মহিলাকে দেখা যায়, স্বামীর টাকা-পয়সা খরচে কোন হিসাব করে না। আপন খেয়াল-খুশীমত যা ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে থাকে। যতসব অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও বিলাস সামগ্রী ক্রয় করতেও স্বামীকে বাধ্য করে। চা, কফি, পান-সুপারী ইত্যাদিতে এত বাড়াবাড়ি করে যে, নিজেও খায় এবং যে কেউ ঘরে এলে তাকেও দেয়। আর এটাকে স্বামীর দায়িত্ব মনে করে।

অথচ ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, চা, কফি ও মওসুমী ফল ইত্যাদির খরচ প্রদান করা স্বামীর দায়িত্ব নয়। উল্লিখিত বস্তুসমূহে যদি কেউ অভ্যস্তও হয়ে যায় এবং তা ত্যাগ করা তার জন্য কষ্টকর হয়, তবুও স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার টাকা-পয়সা দ্বারা তা ক্রয় করা জায়েয নেই। এ প্রসংগে সুবিখ্যাত ইসলামী আইনগ্রন্থ 'রাদ্দুল মুহ্‌তার" এর উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

"قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ لَهَا الْقَهْوَةُ وَالدُّخَانُ وَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهَا ·

"পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, স্ত্রীর কফি ও ধূমপানের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর আবশ্যক নয়। যদিও স্ত্রীর জন্য তা ত্যাগ করা কষ্টকর হয়।" (রাদ্দুল মুহ্‌তার)

এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী স্বেচ্ছায় কিছু খরচ করলে সেটা তার উদারতা। তবে স্বামীর জন্য উচিত এটাই যে, আল্লাহ তাকে স্বচ্ছলতা দান করে থাকলে, স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভের বৈধ উপকরণ দানে কোনরূপ কার্পণ্য না করা। আবার স্ত্রীর জন্যও শোভনীয় নয় যে, এ শান্তি লাভ করতে গিয়ে স্বামীর উপর আর্থিক চাপ প্রয়োগ করে তাকে কষ্ট দেবে।

স্ত্রীর প্রতি মহৎ আখলাক ও সদাচরণের দাবীও এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেমন স্বচ্ছলতা দান করেছেন, সে তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী নিজে যেমন চলবে, স্ত্রীকেও তেমন চালাবে। ইসলামের শিক্ষা হলো, স্ত্রীকে যথাসম্ভব সুখে-শান্তিতে রাখা, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতে না দেয়া, তার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি না করা। তার ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে উদারতা প্রদর্শন করা, তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকা এবং তার পক্ষ হতে অবাঞ্ছিত কোন আচরণ হয়ে গেলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। সর্বোপরি স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন অনুসরণ করা।

মহিলাদের পক্ষ হতে একটি অন্যায় বাড়াবাড়ি এই যে, তারা স্বামীর কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে অযথা জোড়ায় জোড়ায় কাপড়ের স্তূপ জমা করতে থাকে

এবং প্রতিনিয়ত স্বামীকে নতুন নতুন পোশাক বানিয়ে দেয়ার জন্য ফরমায়েশ দিতে থাকে।

স্মরণ রাখা উচিত, স্বামীর দেয়া কাপড়-চোপড় থাকা অবস্থায় পুনরায় নতুন কাপড় বানিয়ে দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয়। ঈদ কিংবা নতুন কোন উৎসব উপলক্ষে নতুন কাপড় দেয়াও স্বামীর দায়িত্ব নয়। তবে স্বামী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের পক্ষ হতে দিলে সেটা তার অনুগ্রহ।

স্ত্রীর অলংকারের যাকাত, ফিৎরা ও কুরবাণী

স্ত্রীর মালিকানাধীন অলংকারের যাকাত, তার সদকায়ে ফিতর ও কুরবাণী আদায় করা স্বামীর দায়িত্ব নয়। স্ত্রীর উপর যাকাত, সদকায়ে ফিতর ও কুরবানী ওয়াজিব হলে তা তাকেই আদায় করতে হবে। তবে স্বামীর উচিত স্ত্রীকে তার প্রয়োজনীয় খরচ ছাড়াও নিজের সাধ্যানুযায়ী অতিরিক্ত কিছু খরচ দিয়ে দেয়া। যেন স্ত্রী প্রয়োজনবশত তা দ্বারা তার যাকাত, ফিৎরা ও কুরবাণী আদায় করতে পারে। স্ত্রী তো আর নিজে উপার্জন করে না। স্বামীর পক্ষ হতে আবশ্যক খরচের অতিরিক্ত কিছু যদি সে পায়, তাহলে তা দ্বারা উক্ত ওয়াজিবসমূহ আদায় করা তার জন্য সহজ হবে। তবে এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়।

স্বামী অতিরিক্ত টাকা-পয়সা না দিলে স্ত্রী প্রয়োজনবোধে নিজের অলংকার বিক্রি করে ওয়াজিব আদায় করবে। কিন্তু এজন্য স্বামীর সম্মতি বা অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। স্বামীর অনুমতি না থাকলে কিছুতেই তা জায়েয হবে না। মহিলারা এক্ষেত্রে বড়ই অসতর্কতার পরিচয় দেয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া এটা জায়েয না হওয়াকে তারা কোন পরোয়াই করে না।

স্বামীর মাল হতে দান খয়রাত

হাদীস শরীফে আছে, স্বামীর সম্পদ হতে তার অনুমতি ছাড়া কোথায়ও কাউকে দান করা জায়েয নেই। অন্য এক বর্ণনা মতে, “স্ত্রী স্বামীর গৃহে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে কোন কিছু দান করবে না।” তখন প্রশ্ন করা হলো, খাবারও কি কাউকে দান করবে না ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “খাবার তো সর্বোত্তম সম্পদ।”

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন "مِنْ حُلِيِّكُنَّ" (তোমাদের অলংকার থেকে।) "مِنْ حُلِيِّ الزَّوْجِ" (স্বামীর অলংকার থেকে) বললেন না। অর্থাৎ, দান-খয়রাত করা খুবই মহৎ কাজ। তবে তা নিজের মালিকানাধীন সম্পদ হতে, স্বামীর সম্পদ হতে নয়।

অতএব, স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ হতে ধর্মীয় কোন খাতেও দান করা জায়েয নেই। যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসায় চাঁদা দেয়া, ফকীর-মিসকিনকে দান করা কিংবা কোন নিঃস্ব আলিম, এতিম, বিধবা ও অভাবগ্রস্তের খিদমত করা। এ জাতীয় দান আল্লাহ তা'আলার নিকট কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস শরীফের ভাষ্য ঃ "اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ" "নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। একমাত্র পবিত্র জিনিসই তিনি গ্রহণ করেন।"

স্বামীর টাকা-পয়সা দ্বারা তার অনুমতি ছাড়া কোন আসবাবপত্র ক্রয় করাও জায়েয নেই। অনেক মহিলাকে দেখা যায়, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রতি তাদের মাত্রাতিরিক্ত মোহ। কোন জিনিস পছন্দ হতে দেরী, খরিদ করতে দেরী নেই। প্রয়োজন আছে কি নেই তা ভেবে দেখারও অপেক্ষা করে না। এভাবে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্তূপ জমা করতে থাকে। অতঃপর স্তূপীকৃত বস্তুসমূহ না কোন কাজে আসে, আর না সেগুলো হেফাজত করার কোন ব্যবস্থা করা হয়। বরং অযথা বিনষ্ট হতে থাকে। স্বামীর সম্পদ ও টাকা-পয়সা এভাবে বিনষ্ট করার জন্য কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে ঈদ কিংবা অন্য কোন উৎসব উপলক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার টাকা-পয়সা দ্বারা কাপড়-চোপড় ক্রয় করাও জায়েয নেই।

স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষাদান

ইতিপূর্বে স্ত্রীর যে সমস্ত হক বা অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো ছিলো তার জৈবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সংশ্লিষ্টদের জৈবিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনে সচেষ্ট হওয়া আরো অধিক আবশ্যক। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا"

"তোমরা নিজেরাদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের প্রত্যেকেই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

স্ত্রীর আত্মার খোরাক প্রদান– অর্থাৎ, তাকে ধর্মীয় শিক্ষা ও দীক্ষায় গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের অবহেলার অন্ত নেই। সমাজের বৃহত্তম অংশ এটাকে কোন প্রয়োজনই মনে করে না। নিজের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে কখনও দ্বীনের কথা, নামাজ-রোজার কথা বলে না এবং কোন অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে না। স্ত্রীর পার্থিব প্রয়োজন পূরণ এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করে। এতটুকু করেই নিজেকে দায়মুক্ত মনে করে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর দু'ধরনের অধিকার রয়েছে। (এক) জৈবিক অধিকার (দুই) ধর্মীয় অধিকার।

অধিকাংশ লোকই স্ত্রীর জৈবিক অধিকার পূরণ করাকে শুধু নিজের দায়িত্ব মনে করে। অর্থাৎ, স্ত্রীর খাওয়া-পরা, কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করে দেয়া, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, স্ত্রী কোন আবদার করলে তা পূরণ করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে স্ত্রীর ধর্মীয় অধিকার আদায়কে নিজের কোন দায়িত্বই মনে করে না। বরং তার উপর স্ত্রীর ধর্মীয় কোন অধিকারের কথা চিন্তাও করে না। এজন্যই ঘরে এসে এ কথা তো জিজ্ঞেস করা হয়, খাবার প্রস্তুত হয়েছে কি হয়নি ? কিন্তু নামাজের কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করা হয় না। ঘরে খাবার খেতে এসে যদি দেখতে পায়, এখনো খাবার প্রস্তুত হয়নি কিংবা প্রস্তুত হলেও তা রুচিসম্মত হয়নি, তখন ক্রোধ ও উত্তেজনার সীমা-পরিসীমা থাকে না।

অথচ যদি কখনও দেখতে পায়, স্ত্রী এ ওয়াক্তের নামাজ এখনো পড়েনি কিংবা এ বছর তার অলংকারের যাকাত দেয়নি কিংবা শরীয়তের অন্য কোন হুকুম লংঘন করেছে, তখন আর তার কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। অনেক পুরুষ তো এমনো আছে যে, স্ত্রী গোটা জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজও যদি না পড়ে, যাকাত আদায় না করে, তবুও তার কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় না।

স্ত্রীর দ্বীনী হক আদায়ের উপায়

পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে স্ত্রীর ধর্মীয় অধিকারের প্রতি কোন গুরুত্বই নেই। না স্ত্রীর নামাজ রোজার প্রতি লক্ষ্য আছে। আর না তার অন্যান্য ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি গুরুত্ব আছে। ধর্মীয় বিষয়টি কেউ স্ত্রীর কানে দিতেও রাজী নয়।

স্মরণ রাখা উচিত, কিয়ামত দিবসে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও আপন পরিবার পরিজনকে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর পরিচালিত করার ব্যাপারে কে কতটুকু চেষ্টা করেছে ?

তবে স্ত্রীকে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর পরিচালিত করার অর্থ এই নয় যে, নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য তার উপর সীমাতিরিক্ত কঠোরতা করবে। সর্বদা হাতে লাঠি নিয়ে তাকে সোজা করার কাজে ব্যস্ত থাকবে। বরং প্রথমে নম্রতা-কোমলতার সাথে বুঝাতে থাকবে। এতে কাজ না হলে তার সাথে কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে কিছুটা অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করবে। ফলে অচিরেই অত্যন্ত ভালো সুফল দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

স্ত্রীকে ধর্মীয় বই পুস্তক পড়াবে, লেখাবে এবং শুনাবে। ফলে তার আখলাক ও চরিত্র পরিশোধিত হবে এবং নিজে থেকেই তার মধ্যে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হবে। স্ত্রী যদি বই-পুস্তক পড়তে আগ্রহী না হয়, তাহলে প্রাত্যহিক একটি সময় নির্ধারণ করে 'বেহেশ্‌তী জেওর' কিংবা কোন আলিমের পরামর্শানুযায়ী অন্য কোন কিতাব নিজে পাঠ করে শুনাবে। প্রথম প্রথম স্ত্রীকে নিজের পক্ষ থেকে এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, "আমি পড়ি এবং তুমি শুনো।" বরং নিজে উঁচু আওয়াজে পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ! সে নিজেই আগ্রহী হয়ে তোমার কাছে বসে শুনতে শুরু করবে। এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে স্ত্রী অচিরেই তোমার অনুগত হয়ে যাবে এবং তার মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে।

মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক নম্র-কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। অল্পতেই তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। অতএব, নিয়মিত ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে শুনাতে থাকলে তাদের চিন্তা ও মনোজগতের পরিবর্তন ও সংশোধন অবশ্যই হবে।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে পুরুষদের অভিযোগের অন্ত নেই। অভিযোগের পর অভিযোগ চলতেই থাকে– স্ত্রী বড় অসৎ, অসভ্য, অজ্ঞ-মূর্খ, এছাড়াও আরো কতো রকমের অভিযোগ। কিন্তু একবারও কোন পুরুষ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা একটু দেখে না যে, সে স্ত্রীর সাথে কিরূপ আচরণ করছে। স্ত্রী থেকে শুধু নিজের সুখ ও আরামের প্রত্যাশীই হবে, তাকে শুধু ভোগই করবে। অথচ তার দ্বীন ও ধার্মিকতার প্রতি কোনই লক্ষ্য করবে না। তাকে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর চালানোর ব্যাপারে কোন ভূমিকাই রাখবে না।

মহিলাদের ভুল ক্রটি তো হবেই। তাদের ভুল হওয়াই প্রকৃতির দাবী। কারণ তাদের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি দুর্বল। কিন্তু তাদের ভুলের সাথে সাথে পুরুষদেরও এমন ভুল করা কি নির্বুদ্ধিতা নয় যে, তাদের দ্বীনদারী ও শরয়ী হুকুম আহ্‌কামের প্রতি কোন গুরুত্বই দিবে না ?

আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে দ্বীনদারীর উপর চলার তাওফীক দিয়েছেন এবং দ্বীনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ববোধও যাদের আছে, তাদেরকেও দেখা যায়, শুধু

প্রথাগতভাবে স্ত্রীকে নামাজ, রোজার আদেশ করেই নিজেদেরকে দায়মুক্ত মনে করে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি স্ত্রীকে নামাজের ব্যাপারে কেন সতর্ক করনা? তখন জবাব শুনিয়ে দেয়, আমার দায়িত্ব তো শুধু তাকে নামাজের কথা বলা। সে নামাজ পড়লো কি পড়লো না তা দেখার দায়িত্ব আমার নয়।

আমি (হযরত থানবী রঃ) বলবো, স্ত্রীকে নামাজ, রোজা ও শরয়ী হুকুম-আহ্‌কামের ব্যাপারে কি ততটুকু গুরুত্বের সাথে বলা হয়, যতটুকু বলা হয় তরকারীতে লবণ কম-বেশি হওয়ার কারণে? এক দু'বার নামাজের জন্য সতর্ক করার পর নামাজের প্রতি যত্নবান না হলে যে নিরবতা পালন করা হয়, একাধিকবার বলা সত্ত্বেও তরকারীতে লবণ ঠিক না হলে কি সেই নিরবতা পালন করা হয় ?

তরকারীতে লবণ কম-বেশি হওয়ার কারণে তো স্ত্রীর উপর দৈহিক নির্যাতন চালাতেও দ্বিধাবোধ হয় না। এজন্য ক্রোধ ও উত্তেজনার মাত্রা এ পর্যায়ে বৃদ্ধি পায় যে, স্ত্রী অতি দ্রুত তরকারীতে লবণ ঠিক করে ফেলতে অভ্যস্থ হয়। কিন্তু নামাজের জন্য কি কখনও ক্রোধ ও উত্তেজনার মাত্রা এ পর্যায়ে উঠেছে যে, স্ত্রী বুঝে ফেলতে বাধ্য হয় যে, "স্বামী চরম নাখোশ। সুতরাং নামাজের প্রতি আমার যত্নবান না হয়ে আর নেই।" নামাজে অবহেলার জন্যও যদি তরকারীতে লবণ কম-বেশি হওয়ার অনুরূপ ক্রোধ ও উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, তাহলে অবশ্যই স্ত্রী নামাজের প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হতো। একবার বলার পর তা ফলদায়ক না হলে বার বার স্ত্রীকে নামাজের কথা বলতে থাকলে এবং নামাজে অবহেলার জন্য বিভিন্ন উপায়ে তার প্রতি স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে থাকলে– যেমন তার সাথে শয্যাগ্রহণ ত্যাগ করা, তার পাকানো খাবার না খাওয়া, তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ইত্যাদি– তাহলে সে নামাজের প্রতি যত্নবান না হয়ে যাবে কোথায়? যেমন, তরকারীতে লবণ কম-বেশি হতে থাকলে তার জন্য কেউ একবার বলে ক্ষান্ত হয়ে যায় না; বরং বারবার সতর্ক করতে থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। যে কেউ কখনও এ চিন্তা করে না যে, এতবার বলা সত্ত্বেও যখন তরকারীতে লবণ ঠিক হলো না, তখন আর বলার প্রয়োজন নেই; বরং নিরবে সয়ে নেয়াই আমার জন্য শ্রেয়।

ইনসাফের সাথে বলুন তো দেখি, স্ত্রীর নামাজের অবহেলার ব্যাপারে আমরা যেমন নিজেকে বুঝ দেই, বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয় নেই, খাবার বা তরকারীতে ত্রুটি হতে থাকলে কি তেমন করি ? কিছুতেই নয়। এটা তো স্ত্রীর দ্বীনি হুকুকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবহেলা। স্ত্রীকে নামাজের প্রতি যত্নবান বানানোর সদিচ্ছা থাকলে তা মোটেই কঠিন কোন কাজ নয়। কেননা নারী শাসক নয়; বরং সে পুরুষের শাসনাধীন। পুরুষের শরীয়ত সম্মত যে কোন হুকুম সে অবনত শিরে

মেনে নিতে বাধ্য। এজন্যই তো নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তার উপর যে কোন হুকুম প্রয়োগ করা যায়। তাহলে দ্বীনের জন্য কেন তার উপর হুকুম আরোপ করা যাবেনা ? স্ত্রীর উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও দ্বীনী বিষয়সমূহে তা প্রয়োগ না করা তার দ্বীনী অধিকার আদায়ে উদাসীনতা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচ

পরিবারের আবশ্যকীয় খরচ ছাড়াও স্ত্রীকে তার ব্যক্তিগত খরচের জন্য নিয়মিত কিছু টাকা দেয়া আবশ্যক। যা সে ইচ্ছামত নিজ প্রয়োজনে খরচ করবে। এর পরিমাণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থা ও সংগতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। ব্যক্তিগত খরচ দেয়ার সময় অবশ্যই স্পষ্ট করে দিবে যে, "এ টাকা সংসার খরচের জন্য, আর এ টাকা তোমার ব্যক্তিগত খরচের জন্য। তুমি এ টাকার মালিক। যেখানে ইচ্ছা তা খরচ করতে পারবে।" ব্যক্তিগত খরচের টাকা পৃথকভাবে দিয়ে দিলে, পারিবারিক খরচের জন্য প্রদত্ত টাকার হিসাব নিকাশ চাওয়ার সুযোগ থাকবে।

কেননা যে কোন মানুষের ব্যক্তিগত কিছু খরচ থাকে। ব্যক্তিগত খরচ যদি স্ত্রীকে পৃথকভাবে দেয়া না হয়, তাহলে স্বভাবতই সে সংসার খরচের জন্য প্রদত্ত টাকায় খেয়ানত করতে বাধ্য হবে। এ অবস্থায় তার উপর কঠোরতা করা এক ধরনের জুলুম ও নির্দয়তা।

মানুষ মাত্রের কিছু দ্বীনী ও দুনিয়াবী খরচের ক্ষেত্র থাকে। মহিলাদের কাছে সাধারণত আলাদা কোন টাকা-পয়সা থাকে না। এজন্য স্বামীর উচিত স্ত্রীকে তার আবশ্যকীয় খরচের অতিরিক্ত সাধ্যমত নিয়মিত কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়া এবং তার হিসাব না নেয়া। যা সে তার ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত দ্বীনী ও দুনিয়াবী ক্ষেত্রসমূহে খরচ করবে। তাছাড়া স্ত্রীর অলংকারের যাকাত, সদকায়ে ফিতর ও কুরবাণী আদায় করা যেহেতু স্বামীর দায়িত্ব নয়। সেহেতু তার কাছে এমন কিছু টাকা থাকা প্রয়োজন, যা দ্বারা সে উক্ত ওয়াজিবসমূহ আদায় করতে পারে। তবে এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। স্বামী না দিলে স্ত্রী নিজের অলংকার বিক্রি করে যাকাত, সদকায়ে ফিতর ও কুরবাণী আদায় করবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে উক্ত ওয়াজিবসমূহ আদায় করা জায়েয নেই। মহিলারা এক্ষেত্রে বড়ই অসতর্ক। স্বামীর সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সম্পদ মনে করে তা যথেচ্ছা খরচ করতে থাকে। এটা মোটেই ঠিক নয়।

স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা

শুধু ভাত-কাপড়ই স্ত্রীর হক নয়। বরং স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা, তার প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও সদাচরণ করাও তার একটি হক। হাদীস শরীফে আছে ঃ

"اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوانٌ عِنْدَكُمْ"

"স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট কয়েদীর মত।"

আর যে ব্যক্তি কারো হাতে বন্দী এবং সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তার উপর দমন-পীড়ন চালানো বীরত্বের কাজ নয়।

মনোরঞ্জন করার অর্থ হলো, স্ত্রীর প্রতি এমন কোন আচরণ না করা, যা দ্বারা তার অন্তর আঘাত পায়। ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তো স্ত্রীর এমন সুনির্দিষ্ট হক, যা সম্পর্কে সকলে অবগত। কিন্তু স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা এবং তার মন যুগিয়ে চলা এমন একটি ব্যাপক কাজ, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এজন্য স্ত্রীর অন্তরে আঘাতদানকারী প্রতিটি কথা ও কাজ থেকেই নিজেকে নিবৃত্ত রাখা জরুরী। স্ত্রীর হক বা অধিকার অগণিত। তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব নয়। অতএব, স্ত্রীর সাথে প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেয়াই শুধু তার হক নয়। বরং তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকাও আবশ্যক। ফিকাহবিদগণ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাকে খুশী করার জন্য তার সাথে মিথ্যা বলাকেও তাঁরা জায়েয মনে করেন। এর দ্বারা স্ত্রীর হকের গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা মহান আল্লাহ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর নিজের হক পর্যন্ত মাফ করে দিয়েছেন।

স্ত্রীর মনোরঞ্জন করলে এবং তার মন যুগিয়ে চললে তার মধ্যে কখনও এ জাতীয় চিন্তা আসবে না যে, "আমিও যদি পরদা না করতাম, তাহলে অন্যান্য বে-পরদা মহিলাদের ন্যায় আমারও সব কিছু সহজে পূরণ হয়ে যেতো।" এজন্য সুন্দর আখলাক ও মহৎ আচরণের মাধ্যমে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করে চলা উচিত। যেন তার এ বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সে পরদা রক্ষা করে না চললে স্বামী তার প্রতি এরূপ ভালো আচরণ করতো না। মোটকথা, স্বামীর সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার দ্বারা স্ত্রী পরদার কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারবে এবং পরদাহীনতাকে মনে পোষণ করার মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে।

স্ত্রীকে পরদার মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু তার পরদা পালনে সহায়ক ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকা চাই। এমন হওয়া উচিত নয় যে, স্বামী নামাজে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে কামরায় রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যাবে, তার সাথে কাউকে

কথা-বার্তা ও উঠা-বসার সুযোগ দেবে না এবং তার চলাফেরার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। স্ত্রীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরদা পালনে উৎসাহী হওয়ার মত উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়া আবশ্যক। (তবে অবশ্যই তা শরীয়ত সম্মত হতে হবে) যেন গৃহের বাইরে যাওয়ার কল্পনাই তার অন্তরে না আসে। পুরুষরা কখনও মানসিক অস্বস্তি বোধ করলে বাইরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সাথে সময় কাটিয়ে মানসিক স্বস্তি নিয়ে আসে। কিন্তু অসহায় মহিলারা যাবে কোথায় ? পরদা রক্ষা করতে গিয়ে তাদেরকে স্বগৃহেই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়।

এজন্য হয়ত নিজে তাকে সঙ্গ দিবে। নিজের পক্ষে নিয়মিত সঙ্গ দেয়া সম্ভব না হলে কোন সমবয়সী মহিলাকে তার সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিবে। যদি কখনও কোন বিষয়ে তোমার কাছে অভিযোগ-আপত্তিও করে, তবে এটাকে নগন্য বিষয় মনে করে উদারতার দৃষ্টিতে দেখবে। স্বামী ছাড়া তার আর কে আছে ? স্বামীই তো তার একমাত্র অবলম্বন। স্বামী ছাড়া আর কার কাছে সে অভিযোগ ও সমস্যার কথা বলবে। তার পক্ষ হতে কোন অভিযোগ বা দাবী এলে সেটাকে মান-অভিমান ও মহব্বত-ভালোবাসার দাবী মনে করবে। আল্লাহর মেহেরবানী যে, আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে স্বামীভক্তি ও স্বামীর প্রতি মহব্বত-ভালোবাসা অত্যন্ত বেশি। যাকে ইশ্‌ক এর পর্যায়ভুক্ত বলা যায়।

স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করা

ইসলাম পারিবারিক যে সমস্ত অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা আদায়ে অধিকাংশ লোকই ত্রুটি করে থাকে। অনেক পরিবারে দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তার যৌন চাহিদা পূরণকে কোন দায়িত্বই মনে করে না। বছরের পর বছর ধরে বাড়ির বাইরে বৈঠকখানায় কিংবা অন্য কোথাও রাত যাপন করে এবং এ সুযোগে কখনও কখনও অন্য কোন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে বসে। ফলে স্ত্রী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। অথচ স্ত্রীর সাথে রাতে শয্যা গ্রহণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার একটি অন্যতম অধিকার।

কথায় কথায় স্ত্রীর ভুল-ভ্রান্তি ধরা এবং ভুলের শাস্তিস্বরূপ তার সাথে কথা-বার্তা বন্ধ করে দেয়া কিংবা শয্যা ত্যাগ করা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। ভুল যে পর্যায়ের, তার সংশোধনও সে পর্যায়েরই হতে হবে। স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তা বলা, হাসি-আনন্দ করা, তাকে সদা প্রফুল্ল চিত্ত রাখাও স্বামীর একটি দায়িত্ব।

অনেক লোক এমন আছে, যারা নিজেদেরকে পীর-বুযুর্গ বা কোন পীর-বুযুর্গের মুরিদ বলে দাবী করে, নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগী ও জিকির

আজেকারে সদা মশগুল থাকে এবং মনে করে, যেন জান্নাত খরিদ করে নিয়েছে। অথচ স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। স্মরণ রাখা উচিত, নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু সময় স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তা বলা, তার সুখ-দুঃখের কথা শুনা এবং তাকে আনন্দ দানে সচেষ্ট থাকা তার প্রাপ্য অধিকার। অধিকাংশ মানুষই এ অধিকার আদায়ে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এটাকে নিজের দায়িত্বই মনে করে না। শুধু ভাত-কাপড় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাকেই একমাত্র দায়িত্ব মনে করে।

স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তু খরিদ করলে তা অপচয় হবে না। কেননা স্ত্রীকে খুশী করা একটি সাওয়াবের কাজ। আর সাওয়াবের কাজে অর্থ ব্যয় অপচয় নয়। তবে এজন্য নিজের সাধ্যের বাইরে ঋণ করাও উচিত নয়। মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে নিজ হাতে খাওয়ানোও একটি ভালো কাজ। এর দ্বারা পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এজন্য বিশেষ প্রতিদান রয়েছে।

ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

আমার ফতোয়া নয়, পরামর্শ হলো, ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্ত্রীর হাতে রাখবে কিংবা নিজের হাতে রাখবে। অন্য কারো হাতে রাখা উচিত নয়। চাই সে ভাই-বোন কিংবা মা-বাবাই হোক না কেন। এর কারণে স্ত্রী বড়ই ব্যথিত ও মর্মাহত হয়। এজন্য ঘরের যাবতীয় খরচ হয়ত স্বামী নিজ হাতে করবে। নিজের পক্ষে সম্ভব না হলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বাধিক হকদার স্ত্রী। স্ত্রীকে ভাত-কাপড় ও বাসস্থান দেয়াই শুধু তার প্রাপ্য নয়। বরং তার অন্তর খুশী রাখাও তার একটি হক।

স্বামীর সাথে স্ত্রীর মান-অভিমান

ইফকের ঘটনায় মুনাফিকরা যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিলো, তখন একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন, আয়েশা ! তুমি যদি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও পূত-পবিত্র হয়ে থাকো, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমার পূত-পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি বাস্তবেই তোমার পক্ষ হতে কোন অন্যায় ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ও ইসতিগ্‌ফার করে নাও।

এ কথায় হযরত আয়েশা (রা) খুবই মর্মাহত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জানিনা আমি আপনার এ কথার কি উত্তর দেবো। যদি

বলি, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাহলে তা আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি বলি, আমার উপর আরোপিত অপবাদ সত্য, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি তা হতে পবিত্র, তাহলে তা আপনারা গ্রহণ করে নেবেন। সুতরাং এ অবস্থায় আমি সেই জবাবই দেবো, যা হযরত ইউসূফ (আ)-এর পিতা দিয়েছিলেন।

"فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ"

"ধৈর্যই আমার জন্য উত্তম। তোমরা যা বলছো তার ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।"

এ কথা বলে হযরত আয়েশা (রা) বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়ার আলামত প্রকাশ পেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাযিল শেষ হলো, তখন প্রথম যে কথাটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো ঃ

"أَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ فَقَدْ بَرَّأَكِ اللّٰهُ"

"হে আয়েশা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন।"

অতঃপর তিনি তাঁর উপর অবতীর্ণ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন।

এ সংবাদ শুনা মাত্রই উপস্থিত সকলের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতা-মাতা আনন্দিত হয়ে তাঁকে বললেন, যাও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর শোকর আদায় করো। হযরত আয়েশা (রা)-এর মাতা বললেন ঃ

"قُوْمِىْ يَا عَائِشَةُ وَقَبِّلِىْ"

"আয়েশা! যাও, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে সালাম করো।"

হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ

"وَاللّٰهِ لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ وَإِنِّىْ لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِىْ أَنْزَلَ بَرَاءَتِىْ"

"আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে উঠে যাবো না। আমি একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রশংসা করবো। তিনিই আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন।"

স্থূল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে হযরত আয়েশা (রা)-এর এ জবাবটি কেমন আপত্তিকর! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপরই তিনি বলে দিলেন, "আমি উঠে যাবো না। আমি আল্লাহ ব্যতীত কারো শোকর আদায় করবো না।" অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সামান্যতম বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না। কারণ,তিনি জানতেন– এটা ছিলো তাঁর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিমান। আর স্ত্রী হিসাবে তিনি অভিমান করার অধিকার রাখেন।

অতএব, ভেবে দেখা উচিত যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর এ কঠিন জবাব কিসের ভিত্তিতে ছিলো। এর একমাত্র ভিত্তি মান-অভিমান ছাড়া কিছুই নয়। যা স্বামী-স্ত্রী একজনের প্রতি অপরজনের গভীর ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি হয়। এজন্য মান-অভিমানবশত স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর কঠিন কোন কথা উচ্চারণ করে ফেললে ইসলামী শরীয়তে তার কোন জবাবদিহিতা থাকে না।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিমান করার অধিকার যদি শরীয়ত স্বীকৃত না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-এর উল্লিখিত জবাবে অবশ্যই অসন্তুষ্ট হতেন এবং তাঁকে সতর্ক করে দিতেন। কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরত আয়েশা (রা)-এর জবাবটি অত্যন্ত আপত্তিকর ছিলো। আর এটাতো হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরয়ী হুকুম-আহ্কাম আরোপে কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন।

ফাতেমা নাম্নী জনৈকা মহিলা চুরি করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তার হাত কাটার নির্দেশ জারি করলেন। লোকেরা তার পক্ষে সুপারিশ করতে চাইলো এবং হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা)-কে সুপারিশ করার জন্য নির্ধারণ করলো। কারণ,তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন এবং প্রিয়ভাজন ব্যক্তির পুত্র। ফলে উসামা উক্ত মহিলার পক্ষে দরবারে রিসালাতে সুপারিশ করে বসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন, "শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার কারণে বিগত জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।" অতঃপর বললেন, "এ মেয়েটি যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও হতো, (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে আমি তার হাত কাটতেও দ্বিধাবোধ করতাম না।"

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম প্রয়োগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ছাড় দিতেন না এবং ছাড় দেয়ার ক্ষমতাও তাঁর ছিলো না। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর জবাবটি যদি শরীয়ত বিরোধী হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে

কিছুতেই নিরব থাকতেন না। বরং অবশ্যই তাঁকে সতর্ক করে দিতেন। যখন তিনি নিরব রয়েছেন এবং সতর্ক করেন নি, তাহলে বুঝা গেলো, হযরত আয়েশা (রা)-এর জবাবটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের খেলাফ ছিল না। অতএব, স্বামীর সাথে স্ত্রীর এমন এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্কের সুবাদে আয়েশা (রা)-এর এত বড় কঠিন উক্তিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গ্রহণ করে নিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তা গ্রহণীয় না হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সতর্ক করে দিতেন কিংবা তাঁর উপর কোন আয়াত নাযিল হয়ে যেতো।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর কাছে অধিক খরচ দাবী করলেন। অবশ্য ইসলামের সংকটকালীন সময়ে তাঁরা কখনও এমন দাবী করেন নি। এমনকি গৃহে খাবার পানি না থাকলেও তাঁদের পক্ষ হতে কোন অভিযোগ উঠতো না।

কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধজয়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যখন স্বচ্ছলতা এলো এবং দরিদ্রতা দূর হলো, তখন তাঁরাও নিজেদের স্বচ্ছলতা দাবী করলেন। অথচ এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি স্ত্রীগণের জন্য স্বচ্ছলতা কামনা করবেন তো দূরের কথা, আপন কন্যার জন্যও তা পছন্দ করতেন না। সর্বদা তিনি এ দু'আ করতেন ঃ

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا"

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবার পরিজনের রিযিক তুমি জীবন ধারণের পরিমাণ করে দাও।"

মোটকথা, স্বচ্ছলতা ও সম্পদের প্রাচুর্য ছিলো তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতির খেলাফ। এজন্য উম্মাহাতুল মু'মেনীন স্বচ্ছলতা দাবী করার কারণে তিনি ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। এবং নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ

"يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا"

"হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহ্যাব, আয়াত- ২৮, ২৯)

উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট তাশরীফ আনলেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অন্যান্য স্ত্রীগণের তুলনায় সবচেয়ে কম বয়সী। তাই তিনি তাঁকে আয়াতগুলো শুনানোর পূর্বে বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। তুমি তার উত্তর প্রদানে তাড়াহুড়া করবে না। বরং তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে জবাব দিবে। অতঃপর তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। হযরত আয়েশা (রা) তা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন ঃ

"أَفِىْ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ؟"

"এমন একটি বিষয়ে আমি আমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করবো ?" আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ জবাব শুনে সীমাহীন আনন্দিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ জবাব অন্য কোন স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করবেন না। তিনি বললেন, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি তা গোপন করবো না।

ভেবে দেখা উচিত, মহান আল্লাহ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের স্বচ্ছলতা কামনা করাকে পছন্দ করলেন না। আবার তাঁদের মান-অভিমান সুলভ আচরণের উপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করলেন না। অতএব, বুঝা গেলো, মান-অভিমান ততটুকু দূষণীয় নয়, যতটুকু দূষণীয় স্বচ্ছলতা ও পার্থিব বিলাসিতা কামনা করা। অথচ আমাদের সমাজের অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ এর বিপরীত। পার্থিব বিলাসিতা কামনা করাকে দূষণীয় মনে করা হয়না। যা কোন না কোনভাবে অবশ্যই নিন্দনীয়। আর স্ত্রীর মান-অভিমান ও অকৃত্রিম আচরণকে দূষণীয় মনে করা হয়। যা কোনভাবেই দূষণীয় নয়।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনের অভিমান

একবার হযরত উমর (রা) জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কোন স্ত্রী তাঁর সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলেন এবং তাঁকে জিদের সাথে বিভিন্ন জিনিসের ফরমায়েশ করেন। উমর (রা) উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা) গৃহে অবস্থান করছেন। তিনি তাঁদেরকে শাসিয়ে বললেন, "তোমাদের কি ভয় নেই? অন্যান্য নারীদের মত তোমরাও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে শুরু করেছো? মনে রাখবে! ধ্বংস হয়ে যাবে।"

উম্মাহাতুল মু'মিনীনের এ উঁচু আওয়াজে কথা বলা এ জন্য ছিলো যে, তাঁরা জানতেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। কেননা তাঁদের এটা ছিলো মান-অভিমান প্রসূত। অন্যথায় তাঁদের অজানা ছিলো না যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলা জঘন্য অপরাধ। কারণ, সূরা হুজুরাতে এর উপর সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিমান

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের অবস্থা এই ছিলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ অনেক সময় তাঁর সাথে জিদ করতেন এবং তিনি নিরবে তা সয়ে নিতেন। একবার তিনি নিজে স্ত্রীগণের সাথে জিদ করেছিলেন।

একবারের ঘটনা ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে তাশরীফ আনলেন। তখন দরোজা থেকে আয়েশা (রা) কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঁচু আওয়াজে বাক্য বিনিময় করতে শুনলেন। হযরত আবু বকর (রা) উত্তেজিত হয়ে গেলেন। গৃহে প্রবেশ করে তিনি কন্যা আয়েশা (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি শুনছিলাম তুমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঁচু আওয়াজে বাক্য বিনিময় করছিলে। এ কথা বলে তিনি তাঁকে চড় মারার জন্য হাত উত্তোলন করলেন। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিবৃত্ত করলেন।

হযরত আবু বকর (রা) গৃহ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে বললেন, দেখলে, আমি কিভাবে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম ? অন্যথায় আজ তো তোমার পিঠ যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে বললেন, তুমি যখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হও, আমি তা বুঝতে পারি। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কিভাবে? উত্তরে বললেন, যখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তখন বলে থাকো- "لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ" "না, মুহাম্মদের প্রতিপালকের কসম।" আর যখন অসন্তুষ্ট থাকো, তখন বলো- "لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ" "না, ইবরাহীমের প্রতিপালকের কসম।" অসন্তুষ্টির সময় তুমি 'রাব্বি মুহাম্মদ' বল না।

হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আপনার ধারণা সঠিক, হে আল্লাহর রাসূল! তবে অসন্তুষ্টির সময় আপনার নাম মুখে উচ্চারণ না করলেও আমার অন্তর থেকে তা বিস্মৃত হয় না।

হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেমন গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা ছিলো। তেমনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও হযরত আয়েশা (রা)-এর সর্বাধিক গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা ছিলো। তাঁর আবৃত্তিকৃত একটি পঙক্তি নিম্নরূপঃ

لَوْ اَخِى زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِيْنَهٗ * لَاَثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوْبَ عَلَى الْيَدِ

"জুলায়খার নিন্দুকেরা যদি তাঁর আলোকাদ্ভোসিত চেহারা মুবারক অবলোকন করতো, তাহলে অবশ্যই হাতের পরিবর্তে নিজেদের অন্তর কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতো।"

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত প্রেমাসক্ত থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও তাঁর সাথে রাগ করে বসতেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কিছুই বলতেন না। কারণ, তাঁর এ রাগ বা অসন্তুষ্টি ছিলো মূলত স্ত্রী হিসাবে স্বামীর সাথে মান-অভিমান।

দশম অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক জীবন

রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহীয়সী স্ত্রীগণের সাথে এমন মহৎ আখলাকের পরিচয় দিতেন, যা শুনে আজকের সভ্যতার দাবীদারগণ রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। তাদের এ অবাক হওয়াতে আমাদের কিছু যায় আসে না। বরং তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমাদের হাসি পায়। তাঁর বাস্তব জীবন ও ঘটনাবলীকে আমরা তাদের কোনরূপ খুঁত অন্বেষণের ভয়ে ভীত হয়ে গোপন রাখতে পারি না।

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গোপন রাখার কোন প্রয়োজন আছে। আমরা প্রকাশ্যে তা পেশ করে দিতে চাই। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তো আর বোকা নয়। আল্লাহ যাদেরকে সুস্থ জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি দান করেছেন, তারা অবশ্যই এর যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

আপন স্ত্রীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন আখলাক ছিলো যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বাধিক কম বয়সী হওয়ার কারণে তিনি তাঁর বয়সের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করে সর্বদা তাঁর মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অল্প বয়সী ও হালকা পাতলা গড়নের। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী ও ভারী দেহবিশিষ্ট। তাই এ দৌড় প্রতিযোগিতায় হযরত আয়েশা (রা) অগ্রগামী হয়ে গেলেন।

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। এবার তিনি আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অগ্রগামী হলেন। কেননা হযরত আয়েশা (রা)-এর দেহ ইতিমধ্যে ভারী হয়ে গিয়েছিলো। মহিলাদের শরীর সাধারণত তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে যায়। তাই তিনি এবার আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারলেন না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী হয়ে গেলেন এবং বললেন, "تلك بتلك" "এটা প্রথমবারের বিনিময়।" অর্থাৎ, প্রথমবার তুমি অগ্রগামী হয়েছিলে। এবার আমি অগ্রগামী হলাম।

সুবহানাল্লাহ! কী মহৎ তাঁর চরিত্র! নবীকুল শিরোমণি হয়েও তিনি আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন যে, এটা কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অর্থহীন কাজ ছিলো?

বস্তুত হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাঁর এ দৌড় প্রতিযোগিতার রহস্য হলো পরবর্তী উম্মতকে শিক্ষা দান করা। অধিক বয়সী পুরুষ অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করলে তার বয়সের দাবী ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজের বয়স অনুপাতে তাকেও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল বানানোর অপচেষ্টা করা নির্বুদ্ধিতা।

ছোট মেয়েদের মন খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ অধিক পছন্দ করে। তাই তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া উচিত। স্বামীর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে সংকোচ বোধ করলে তাদেরকে শুধু কথার মাধ্যমে নয় বরং আচরণের মাধ্যমে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি জানিয়ে দেয়া উচিত। বস্তুত এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে হাবশী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখার সুযোগ দিতেন। তারা মসজিদে নববীর সন্নিকটে তীর দ্বারা খেলতো। এমনকি তিনি তাঁকে পুতুল খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক সময় এমন হতো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে তাশরীফ আনতে দেখে মহল্লার মেয়েরা খেলা ছেড়ে দৌড়ে পালাতো। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে অভয় দিয়ে বলতেন, কোন ভয় নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে খেলো।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের উল্লিখিত ঘটনাবলীতে উম্মতের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী হলে তার বয়সের দাবী অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে। এটাই ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক শিষ্টাচার। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা ও কাজই উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর জীবনের এমন কোন কাজ নেই, যাতে উম্মতের জন্য শিক্ষা নেই।

গৃহে স্বামীর স্বভাব কেমন হওয়া উচিত

আমার জনৈক ধৈর্যশীল ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মুতা'আল্লিক আছে। সে যেখানে বসবে বড়ই গাম্ভীর্যের সাথে বসবে। কারো সাথে হাসি-তামাসা ও আনন্দ-ফুর্তি করা তার ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যেতো না।

একবার আমি ওয়াজের মধ্যে তার সম্পর্কে বললাম, এ ধরনের ভাবগাম্ভীর্য আমার কাছে মোটেও পছন্দনীয় নয়। প্রত্যেক্যের উচিত হাসি-খুশী ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে কথা-বার্তা বলা। এটা কেমন কথা যে, সর্বদা মুখ ফুলিয়ে রাখবে ? এ ধরনের ব্যক্তিকে মানুষ পছন্দ করে না। তার সাথে কারো মহব্বত ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা গাম্ভীর্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অহংকার ছাড়া কিছুই নয়।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ কে আছে ? অথচ তিনি মানুষকে হাস্যোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত চেহারায় সাক্ষাৎ দান করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে হাসি-খুশী অবস্থায় কথা বলতেন। সাধারণ মানুষ যে ভঙ্গিতে কথা-বার্তা বলতো, তিনিও অনুরূপ কথাবার্তা বলতেন। আমাদের ভাবগাম্ভীর্য কি তাঁর চেয়ে অধিক হয়ে গেলো ?

আমার তো অভ্যাস হলো, আমি মাদরাসায় বসে দোস্ত-আহ্‌বাবদের সামনে নিজের ঘরের অবস্থাও বলে ফেলি। এ ব্যাপারে আমার সেই মুতাআল্লিকের দ্বিমত ছিলো। সে বলতো, ঘরের কথা মজলিসে বর্ণনা করে দেয়া ভাব-গাম্ভীর্যের পরিপন্থী। সে তো নিশ্চয় একথা আমার কল্যাণকামী হয়েই বলতো। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা তার ভুল ধারণা।

তাই আমি বললাম, মাওলানা! গাম্ভীর্য এটাকে বলে না। গাম্ভীর্য তো হলো, যা সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত। আপনার এ বাহ্যতঃ গাম্ভীর্যের বদৌলতে আপনি কিছু সুন্নাতের আমল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। আচ্ছা সত্য করে বলুন তো দেখি, আপনি কি কখনও স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ? এটা তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তিনি আয়েশা (রা)-এর সাথে একাধিকবার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমার এ সৌভাগ্য হয়েছে। আমি এ সুন্নাতের উপরও আমল করেছি। আপনি আপনার সেই গাম্ভীর্যের মধ্যেই থাকবেন, যার বদৌলতে পারিবারিক জীবনের একটি সুন্নাতের আমল কখনও আপনার ভাগ্যে জুটবে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা তো এই ছিলো যে, তিনি নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন। তরি-তরকারী কেটে দিতেন এবং ঘরের বিভিন্ন কাজে স্ত্রীগণকে সাহায্য করতেন। আলহামদুলিল্লাহ! এ সুন্নাতের উপরও আমার আমল করার তাওফীক হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এটাই যে, মুসলমান সহজ সরল জীবন যাপন করবে। আচার-আচরণ, চলাফেরা ও কথা-বার্তায় এমনভাবে থাকবে, যেন অপরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না পায়। মজলিসে বসলে এমনভাবে বসবে, যেন নিজেকে মজলিসের প্রধান মনে না হয়।

হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-এর হাসি-কৌতুক

একবার হযরত আলী (রা) স্ত্রী ফাতেমা (রা)-এর সাথে হাসি-কৌতুকের ছলে নারীদের তিরস্কার করে আরবী এ পঙক্তিটি আবৃত্তি করলেন ঃ

إِنَّ النِّسَاءَ الشَّيَاطِيْنُ خُلِقْنَ لَنَا * نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِيْنِ

"নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের জন্য শয়তান রূপে। আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তানের অনিষ্টতা হতে।"

জবাবে হযরত ফাতেমা (রা) বললেন ঃ

إِنَّ النِّسَاءَ رَيَاحِيْنُ خُلِقْنَ لَكُمْ * وَكُلُّكُمْ يَشْتَهِىْ شَمَّ الرَّيَاحِيْنِ

"নারীরা হলো এমন ফুল যা তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর তোমাদের প্রত্যেকেরই ফুলের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।"

দাম্পত্য সুখ লাভের উপায়

স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তাকে সুখে রাখার মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণও সাধিত হয়। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়। সুখে-দুঃখে একজন অপরজনের অংশীদার হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি একতা, অকৃত্রিমতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, তাহলে এর চেয়ে বড় সুখ পৃথিবীতে আর কি হতে পারে ?

সুখ তো এরই মধ্যে যে, স্বামী গোটা দিন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে কথা-বার্তা ও আচরণ দ্বারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। স্ত্রী তাকে মানসিক ও শারীরিক আরাম ও শান্তি দানে সচেষ্ট থাকবে।

দাম্পত্য জীবন যাদের সুখকর, তারা বস্তুত দুনিয়াতেই জান্নাত লাভ করে ফেললো। আল্লাহওয়ালাগণ স্ত্রীর সাথে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্লচিত্ত থাকার রহস্য এখানেই যে, তাঁরা স্ত্রীকে সুখ-শান্তি দানে ও তার হক আদায়ে সদা যত্নবান থাকেন। ফলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয় সুখ-আনন্দ ও সুশৃংখলার সাথে।

আর যে পরিবারে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ লেগে থাকে, সেখানে সুখের চিহ্নও থাকে না। এটা কেমন জীবন যে, সারাদিন খাটুনি খেটে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে একটু স্বস্তি লাভ করার পরিবর্তে তিক্ততা ও মনোমালিন্য সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা চলবে ? বর্তমানে মানুষের স্বভাব ও তবীয়ত

বিগড়ে গেছে। অনুভূতিহীনতা মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, মানুষ এ অবস্থায় থাকাকেই পছন্দ করে। তবে আল্লাহ যাদেকে সামান্যতম অনুভূতি দান করেছেন, তারা অবশ্য এটাকে দুনিয়ার জাহান্নাম মনে করে।

এমন দাম্পত্য জীবনের কি মূল্য আছে যে, দু'চার দিন হাসি-খুশীতে থাকবে এবং দশদিন ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ চলতে থাকবে ? দাম্পত্য জীবনের যথার্থ স্বাদ তো তখনি আস্বাদন করা যাবে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একজন অপরজনের অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখে।

স্ত্রীকে আরামে ও শান্তিতে রাখার মধ্যে কল্যাণ নিজেরই। এখানে কিছু মহিলা এমন আছে, দাম্পত্য জীবনে যারা অত্যন্ত সুখী। যাদের বয়স অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের কম নয়। অথচ তাদেরকে দেখলে মনে হয় যেন বিয়ের বয়স তাদের সবে মাত্র দু'চার বছর হয়েছে। এবং তাদেরকে কেউ পঁচিশ বছরের অধিক বয়সী বলবে না।

অতএব, স্ত্রীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির সাথে রাখার মধ্যে একটি বড় ফায়দা এটাও যে, স্ত্রী সুস্থ-সবল থাকবে। দুর্বলতা ও রোগব্যাধি তাকে দ্রুত আক্রমণ করবে না। ফলে তার দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বামী উপকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু আফসোস! মানুষ নিজের শান্তি ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেও স্ত্রীর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখে না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য দ্বীনী শিক্ষার সাথে সাথে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষাও রেখে গেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর ঘটনাঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কবরস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অতি সন্তর্পণে উঠলেন, জুতা পরিধান করলেন এবং আস্তে করে দরজা খুললেন। হযরত আয়েশা (রা) এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি এরূপ এজন্য করেছি যে, হয়ত তুমি জেগে যাবে এবং একাকী ভয় পাবে।

স্ত্রীর আরামের প্রতি তিনি কি পরিমাণ যত্নবান ছিলেন! যিনি তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে বাধ্য। আজকাল তো মা-বাবার আরামের প্রতিও এতটুকু লক্ষ্য করা হয় না। যারা সার্বিকভাবেই খিদমত পাওয়ার যোগ্য।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানা থেকে উঠলেন এবং আস্তে করে জুতা পরিধান করলেন এবং

আস্তে করে দরজা খুললেন এবং সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করলেন । হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ ঃ

"وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَأَغْلَقَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ رُوَيْدًا"

"তিনি সন্তর্পণে দরজা খুললেন, সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করলেন এবং সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন।"

হযরত আয়েশা (রা)-এর সন্দেহ হলো, হয়তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করছেন। সন্দেহের কারণ হলো, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সীমাহীন আসক্ত ছিলেন। আর আসক্তির কারণে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। একে তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর গভীর সম্পর্ক। উপরন্তু তিনি ছিলেন তাঁর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত। যা তাঁর আবৃত্তিকৃত নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিতে ফুটে উঠে ঃ

"لَوَاخِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِيْنَهُ * لَأَثَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوْبَ عَلَى الْيَدِ"

"জুলায়খার নিন্দুকেরা যদি তাঁর আলোকোদ্ভাসিত চেহারা মুবারক অবলোকন করতো, তাহলে অবশ্যই হাতের পরিবর্তে নিজের অন্তরকে কেটে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতো।"

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এত অধিক আসক্ত ছিলেন যে, তাঁর কোন আচরণেই তিনি কষ্ট পেতেন না। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আরাম ও শান্তির প্রতি এতটুকু যত্নবান ছিলেন যে, রাতে যখন উঠলেন, তখন সমস্ত কাজ এমন সন্তর্পণে করলেন, যেন তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। যেখানে আয়েশা (রা) কষ্ট পাবেন এমন কল্পনাও করা যায় না, সেখানেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করলেন। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, রাতে যখন ঘুম থেকে উঠবো, তখন হুলস্থুল করে ফেলবো। বিশেষত যদি শক্ত জুতা হয় কিংবা এস্তেঞ্জায় ঢিলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তখন হুলস্থুল করে সবকিছু একাকার করে ফেলবো। যদিও এর দ্বারা অন্যদের সীমাহীন কষ্ট হয়।

একাদশ অধ্যায়
মহিলাদের ত্যাগ ও কুরবানী

পুরুষরা মনে করে, মহিলাদের ভাত-কাপড়, বাসস্থান এবং অন্য সব প্রয়োজন আমাদেরকে পূরণ করতে হয়। এর দ্বারাই তো তাদের সমস্ত হক আদায় হয়ে গেলো। এর উপর আবার তাদের কি হক থাকতে পারে ? অন্য যত হক আছে তা সব মহিলাদের দায়িত্বে, আমাদের দায়িত্বে নয়।

কিন্তু আমি বলবো, তোমাদের দেয়া ভাত, কাপড়ের বিনিময়ে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের যে পরিমাণ খিদমত করে, তা কি সমপরিমাণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন চাকর-চাকরানী করবে ? কখনও নয়। কারো সন্দেহ থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ঘরের যাবতীয় কার্য সম্পাদন একমাত্র স্ত্রীর দ্বারাই হতে পারে। হাজার চাকর-চাকরানী দ্বারাও তা হতে পারে না, যা স্ত্রীর দ্বারা হবে।

আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে চাকর-চাকরানী রেখেছে। কিন্তু স্ত্রী নেই। ঘরের যাবতীয় খরচ চাকর-চাকরানীর হাতে হতো। ফলে খরচের পরিমাণ এত অধিক হতো, যার কোন সীমা পরিসীমা থাকতো না। কিন্তু যখনি বিবাহ করলো, তখনি ঘরের খরচ নিয়ন্ত্রিত হলো। উপরন্তু ঘরে সার্বিক শৃংখলা ফিরে এলো।

আমার মতে স্ত্রী যদি ঘরের কোন কাজই না করে, শুধু ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনা করে, তাহলেও এটা এত বড় কাজ, যার বিনিময়ে দুনিয়ার বিচারে বিরাট অংকের পারিশ্রমিকের প্রয়োজন। তা ছাড়া দেখা শুনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি অতি বড় সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

যে কোন মিল-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা প্রধান ব্যবস্থাপককে বাহ্যত কোন কাজ করতে দেখা যায় না। কারণ, তার অধীনে এত অধিক সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে যে, তার নিজের কোন কাজে হাত লাগানোর প্রয়োজনই থাকে না। অথচ তার পারিশ্রমিক ও মর্যাদা সর্বাধিক। এটা তো এ জন্যই যে, তার উপর অর্পিত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, মহিলাদের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনার কাজটিই এত বড় যে, তার বিনিময় শুধু ভাত-কাপড় ও ভরণ-পোষণ হতে পারে না। উপরন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে দেখা যায়, তারা শুধু ঘরের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং নিজ হাতে ঘরের বহু কাজ আঞ্জাম দেয়।

বিশেষত শিশু-সন্তানদেরকে বড় কষ্ট করে লালন-পালন করে। এটা এমন একটি কঠিন কাজ, যা বেতনভোগী চাকর-চাকরানীর মাধ্যমে কখনও স্ত্রীর সমতুল্য হতে পারে না।

মহিলাদেরকে এত অধিক পরিমাণ কাজ করতে হয় যে, কখনও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারে না। তারা অতি দ্রুত দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণ এটাই যে, তাদেরকে প্রতি মুহূর্ত চরম দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে থাকতে হয়। হাজারো দুশ্চিন্তায় তারা বেষ্টিত থাকে। ঘরের যাবতীয় দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে পুরুষ চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। যত কষ্ট ও পেরেশানী স্ত্রীকেই পোহাতে হয়। কোন পুরুষ যদি অন্তত দু'দিন ঘরের দায়িত্ব পালন করে দেখিয়ে দিতে পারে, তাকে প্রকৃত পুরুষ মনে করবো।

এ পরিমাণ কষ্ট ও পেরেশানী সত্ত্বেও তাদের একটি অতি বড় মহৎ গুণ এই যে, তারা কখনো নিজের কষ্টের কথাটি ভুলেও উচ্চারণ করতে রাজী নয়। বরং সব কষ্ট ও পেরেশানী নিরবে সয়ে নিতে থাকে।

স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের হেফাজতকারী

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক প্রথমত এজন্য যে, সে বড়ই অসহায়। স্বামীই একমাত্র তার আশা-ভরসার স্থল। দ্বিতীয়ত এজন্য যে, স্ত্রী স্বামীর জীবনের পরম বন্ধু। সকল দুঃখ-বেদনার সাথী। আর এ বন্ধুত্বের সূত্রে তার হক ও অধিকার অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

তাছাড়া স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের হেফাজতকারী। তার মাধ্যমে স্বামীর দ্বীন রক্ষিত হয়। কুচিন্তা ও অশ্লীল কল্পনা হতে আত্মরক্ষা করা যায়। এ দিক থেকে সে স্বামীর বড়ই মুহ্সিন। আল্লাহ যাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেছেন, তারা স্ত্রীর এ ইহ্সানের যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকে।

এ জন্য স্ত্রীকে যথার্থ কদর করা উচিত। কারণ, সে যেমন স্বামীর দুনিয়ার সাহায্যকারী অনুরূপ দ্বীনেরও সাহায্যকারী। তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী। মহান আল্লাহ তার মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যার প্রতিটিই স্বামীর কাছে অনেক হকের দাবী রাখে।

আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন এক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যে সম্পর্কের কারণে স্ত্রী স্বামীর জন্য সর্বাধিক শান্তিদানকারী হয়ে যায়। তার চেয়ে অধিক শান্তি পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারে না।

স্বামী অসুস্থ হয়ে যখন বিছানায় ছটফট করতে থাকে, তখন আপনজন সকলে দূরে সরে গেলেও স্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। অসুস্থ স্বামীকে ঘৃণা করে বিছানায় ফেলে চলে যাবে– এটা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না। বরং তখন স্ত্রীই সর্বাধিক আপনজনের পরিচয় দেয়। স্বামীর সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করে। নিজ হাতে তার মল-মূত্র পরিষ্কার করে। এ তো হলো স্ত্রী দ্বারা দুনিয়ার শান্তি। আর দ্বীনী ফায়দা এই যে, স্ত্রীর কারণে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা রক্ষায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায়। ফলে স্বামী মানসিক দিক থেকে পরিপূর্ণ স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্ত্রী ব্যতীত ঘরের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা কিছুতেই ঠিক থাকতে পারে না।

একজন পুরুষ বছরের পর বছর চেষ্টা পরিশ্রম করে মহান আল্লাহর খাস বান্দা হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। অথচ স্ত্রী বিবাহ হওয়া মাত্রই স্বামীর উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়। এরপরও যদি সে স্বামীর মহব্বত ও ভালোবাসা লাভ করতে না পারে, তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে ?

অভাব-অনটন ও বিপদের সময় সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি মা-বাবাও দূরে সরে যেতে পারে। কিন্তু একমাত্র স্ত্রী ই সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় স্বামীর সংগী হয়ে থাকে। রোগশয্যায় শায়িত হলে স্ত্রীর দ্বারা যে খিদমত ও শান্তি পাওয়া যায়, তা এ পৃথিবীতে আর কারো দ্বারা পাওয়া যায় না। চাই সে যতই আপনজন হোক না কেন। এ জন্য দুনিয়ায় একজন পুরুষের জন্য স্ত্রীর চেয়ে আপন আর কেউ হতে পারে না।

স্বামীর জন্য স্ত্রী যে ত্যাগ ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, তা অন্য কেউ দেয় না। অনেক মহিলাকে এমনও দেখেছি যে, সে নিজে অসুস্থ, দাঁড়ানোর শক্তি পর্যন্ত তার নেই, এ অবস্থায়ও স্বামী অসুস্থ হলে তখন সে নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে যায়। নিজেকে কোনভাবেই আর স্থির রাখতে পারে না। নিজের আরামের কথা ভুলে গিয়ে স্বামীর খিদমত ও সেবা-যত্নে মশগুল হয়ে যায়।

আর এটা তো দৈনন্দিনই ঘটে থাকে যে, নিজে চুলার আগুনে জ্বলে পুড়ে রান্না-বান্না করেও খাবার খায় সবার শেষে। প্রথমে পুরুষদেরকে খাওয়ানোর পর কখনও কোন মেহমান এসে গেলে তখন নিজে অনাহারে থেকে মেহমানের জন্য অবশিষ্ট খাবার পেশ করে দেয়। অতঃপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করে নেয়। অন্যথায় অনাহারেই থাকে।

স্বামী দুপুর রাত সফর থেকে ফিরে এলেও স্ত্রী তৎক্ষণাৎ স্বীয় ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে তার জন্য খাবার পাকাতে যায়। তার সেবা-যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমাদের এ অঞ্চলের মহিলারা সীমাহীন স্বামীভক্ত হয়ে থাকে। স্বামীর মহব্বত ও ভালোবাসা তাদের শিরা-উপশিরায় বিরাজ করে। তবে সেই সাথে তাদের মধ্যে কিছু বক্রতাও আছে। নিজের যবানকে সংযত রাখতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য এমন যে, সেগুলোর জন্য তাদের সমস্ত মান-অভিমান ও বক্রতা বরদাশ্‌ত করে নেয়া উচিত। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের সামনে তাদের কোন ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি পড়া উচিত নয়।

স্ত্রীর যথাযথ মূল্যায়ন

স্ত্রী যতই উগ্র ও শিষ্টাচারবিবর্জিত হোক না কেন, তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। কেননা, সে তোমারই জন্য নিজের মা-বাবা ত্যাগ করেছে, আপনজন ত্যাগ করেছে। এখন তুমিই তার আশ্রয়স্থল। তোমারই উপর তার একমাত্র ভরসা। তুমিই তার একমাত্র সম্বল।

সুতরাং মানবতার দাবী এটাই যে, এমন একজন ত্যাগ স্বীকারকারী ও বিশ্বস্ত বন্ধুকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া। তার যে কোন দুর্ব্যবহার ও শিষ্টাচার-বিরোধী আচরণ ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা। কারণ, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তিতে সে অপরিপক্ব। ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতা তার কম। কথা বলার সঠিক পদ্ধতি তার জানা নেই। এ জন্য তার কথা বলার ধরন এমন হয়ে যায় যে, স্বামী কষ্ট পায়। হতে পারে, স্বামী তার যে আচরণকে অশালীন বা শিষ্টাচার বিরোধী মনে করছে, তা ছিলো তার মান-অভিমান। হয়ত সে সঠিকভাবে তা প্রকাশ করতে পারেনি। স্বামী ছাড়া আর কার সাথে সে অভিমান করবে ? দুনিয়াতে স্বামী ছাড়া তার আর কে আছে ?

সকল অবস্থায়ই স্ত্রীকে স্বামীর কদর করা উচিত। কারণ, বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে স্বামীর অধীন ও তার কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেলো। আর কেউ কারো অধীন ও দায়বদ্ধ হয়ে গেলে তার উপর জুলুম-নিপীড়ন চালানো কোন বাহাদুরীর কাজ নয়। তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও সে তোমার যথাযথ কদর ও মূল্যায়ন পাওয়ার যোগ্য। কারণ, তুমি যেমন মুসলমান, সেও তেমনি মুসলমান। তুমি যেমন শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম পালন করছো, সেও পালন করছে। আর একথা তো কেউ বলতে পারে না যে, দ্বীনের দিক থেকে কে আল্লাহ

তা'আলার অধিক নিকটবর্তী। স্ত্রী স্বামীর চেয়ে অধম হওয়া সর্বদা জরুরী নয়। হতে পারে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সে স্বামীর সমতুল্য কিংবা তার চেয়ে উত্তম।

অতএব, স্ত্রীকে কিছুতেই অধম ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। অসহায়, অক্ষম ও আহত হৃদয়ের ক্ষুদ্র আমলও আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক পছন্দনীয়। অল্প আমলের কারণেই তিনি তার মর্যাদা অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। বিচিত্র কিছু নয় যে, অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের কারণে যে নারীকে তুমি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছো, মহান আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। এ জন্য স্ত্রীর সাথে যাবতীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আবার স্ত্রীকেও স্বামীর অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য করে চলা উচিত। কোন অবস্থায়ই স্বামীর সাথে বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

আলিমগণ স্ত্রী পূজারী নন

আল্লাহ যাদেরকে ইলম ও আমলের নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা স্ত্রীকে যথাযথ কদর করে থাকেন। স্ত্রীর ইহ্সানকে তাঁরা কখনও ভুলে যান না।

মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার (র)-এর অবস্থা এই ছিলো, তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার প্রতি মাওলানার মহব্বত এতো অধিক ছিলো যে, সে কখনও অসুস্থ হলে মাওলানা সাথে সাথে মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে এসে তার খিদমতে লেগে যেতেন।

বর্তমানে তো অনেকে স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গেলে তাকে অবজ্ঞা করতে থাকে। অথচ তোমরাই তো তাদেরকে বৃদ্ধা বানিয়েছো। কিন্তু মাওলানার অবস্থা ছিলো, তিনি স্ত্রীর খিদমতের দায়িত্ব চাকর-চাকরানীদের উপর ছেড়ে দিতেন না। বরং মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে এসে নিজে তার খিদমতে মশগুল হয়ে যেতেন।

এ জন্য আলিমগণকে অনেকে স্ত্রীর মুরীদ বলে মনে করে। হাঁ স্ত্রীর কাছে তাদের মুরীদ হওয়া তোমাদের পীর হওয়ার চেয়ে উত্তম। তোমরা তো স্ত্রীর পীর বনে বসো। আসলে আলিমগণ স্ত্রীর মুরীদ নন। বরং তাদের অন্তরে যেহেতু আল্লাহর ভয় রয়েছে, সেহেতু বান্দার হক আদায় করার গুরুত্ব তারা বুঝেন। স্ত্রীর হক তারা কুরআন ও হাদীসে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন তাদের সামনে রয়েছে। তাই তারা স্ত্রীর সাথে নম্র-কোমল ব্যবহার করেন। স্ত্রীকে আরাম ও শান্তি পৌঁছাতে তারা সদা সচেষ্ট থাকেন। বরং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের সাথে যে

পরিমাণ মহৎ আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন, তা তো কোন মাওলানাও দিতে পারে না। কোন আলিম যদি স্ত্রীর সাথে সেরূপ আখলাকের পরিচয় দিতে শুরু করে, তাহলে তো মানুষ তাকে স্ত্রী পূজারীর চেয়ে জঘন্য আরো কতো উপাধি দিতে শুরু করবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর সাথে একাধিক বার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন।

মোটকথা, আলিমগণ স্ত্রীকে এ জন্য অধিক কদর করে থাকেন, কেননা তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবনের শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া, স্ত্রীকে যথাযথ কদর করলে তার দুনিয়াবী কল্যাণ তো আছেই। অতএব, আলিমগণ স্ত্রীর মুরীদ বা স্ত্রী পূজারী নন। বরং স্ত্রীর যথাযথ কদর ও মূল্যায়নকারী।

আল্লাহ ওয়ালাগণের অবস্থা

আল্লাহ ওয়ালাগণ স্ত্রীর প্রতি খুবই যত্নবান থাকেন। স্ত্রীর অধিকার আদায়ে তাঁরা সদা সচেষ্ট থাকেন। স্ত্রীর খুঁটিনাটি দোষত্রুটিকে তাঁরা ক্ষমাসুন্দর ও উদার দৃষ্টিতে দেখেন।

কারণ, তাঁরা মনে করেন, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে এমন একটি মহৎ গুণ দান করেছেন, যার সামনে তাদের ছোট খাটো ত্রুটিসমূহ তুচ্ছ। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী যে, আমাদের এ অঞ্চলের প্রতিটি সম্ভ্রান্ত নারীর মধ্যেই এ গুণটি বিদ্যমান রয়েছে।

উক্ত গুণটি হলো, স্বামী যদি দায়িত্বহীনতা বা অন্য কোন কারণে অথবা কারাবন্দী হয়ে বাড়ি-ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এভাবে পঞ্চাশ বছরও অতিবাহিত হয়ে যায়, সে জীবিত কি মৃত তাও স্ত্রীর জানা না থাকে এবং স্ত্রীর জীবন ধারণ করার মত কোন ব্যবস্থাও যদি না থাকে, তারপরও সে এসে দেখতে পাবে, স্ত্রীকে যে ঘরে সে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই সে অবস্থান করছে। চরম দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও ক্ষুধা-অনাহারে দিন গুজরান করেছে। অসহায়ত্বের চূড়ান্ত পর্যায় তার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অথচ স্বামীর আমানতে খেয়ানত করেনি। কোন পর পুরুষের প্রতি অন্যায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনি।

নিঃসন্দেহে এটি এমন একটি মহৎ গুণ, যে একটি গুণের কারণেই তার সমস্ত মান-অভিমান ও দোষ-ত্রুটি উদারতার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এমন একটি মহৎ গুণের সামনে তার অন্য সকল দোষ-ত্রুটি বিস্মৃত হয়ে যাওয়া উচিত।

আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমাদের অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে স্বামী-ভক্তি এত অধিক যে, তাদের দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় স্বামীর মহব্বত বিরাজ করে। বস্তুত স্ত্রীর উল্লিখিত মহৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণেই আল্লাহ ওয়ালাগণ স্ত্রীর প্রতি পূর্ণমাত্রায় যত্নবান থাকেন এবং স্ত্রীর খুঁটিনাটি দোষ-ক্রুটি উদারতার দৃষ্টিতে দেখেন।

মোটকথা, মহিলাদের মধ্যে কর্কশ ভাষা ও মেজাজের রুক্ষতার ন্যায় বড় বড় অনেক দোষ ক্রুটি থাকলেও তাদের মধ্যে স্বামী-ভক্তি ও স্বামীর প্রতি সীমাহীন মহব্বত ও ভালোবাসার ন্যায় একটি অতি মহৎ গুণও বিদ্যমান রয়েছে, যা যথাসময়ে প্রকাশ পায়।

আমার স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যেতে পারে, আমি তার উপর কি পরিমাণ শাসন প্রয়োগ করেছি, তার থেকে কি কি খিদমত নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি নিজে শাসিত হয়েছি। অপরের উপর শাসন চালাতে যাইনি। সে বাদশাহী জীবন অতিবাহিত করছে।

আমার অভ্যাস হলো, ঘরে গিয়ে নতুন বানানো রুটি না পেলে বাসী রুটি খেয়ে নেই। অনেক সময় এমনও হয় যে, স্ত্রী কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে তখন নিজেই রুটি নিয়ে নেই, গ্লাসে পানি ভরে সাথে নিয়ে নেই এবং বাসনে নিজ হাতে তরকারী নিয়ে বসে খেয়ে নেই। বরং যদি দেখি, সে রান্না ঘরে ব্যস্ত আছে এবং তার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে, তখন নিজ হাতে পুকুর বা কুয়া থেকে পাত্র ভর্তি করে পানি এনে দেই। আবার যদি দেখি তার কোন ব্যস্ততা নেই, তখন বলে দেই খাবার দাও। সে খাবার উপস্থিত করলে বসে খেয়ে নেই।

এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী। তা ছাড়া স্ত্রী ব্যস্ত আছে কি নেই, তা দেখার কি প্রয়োজন? সেও তো মানুষ। মেজাজ– তবীয়ত সব সময় এক রকম থাকা জরুরী নয়। কাজ করতে করতে কখনও তার বিরক্তি এসে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তো তার এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে, তাকেই সব সময় সব কিছু করতে হবে। নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে এবং তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি তার থেকে খিদমত নেয়া যায়, তাহলে অসুবিধা কি ? স্ত্রীর প্রতি নির্দয়তা, অমানবিকতা ও জুলুম-নিপীড়ন করা তো কোনভাবেই সমীচীন হতে পারে না।

আমি ঘরে বহু কাজ নিজ হাতে করে নেই। তাতে আমার এমন কি কষ্ট হয় ? আর আমারই বা এমন কোন্ কাজ অবশিষ্ট থেকে যায় ? বরং যেমন তার খিদমতের কারণে তার দ্বারা আমি আরাম ও শান্তি পাই, সেও আমার দ্বারা একটু আরাম ও শান্তি পায়।

রাতে আমার ঘুম কম হয়। ফলে স্ত্রীকে নিদ্রারত দেখে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি। কারণ, আমার ঘুম না হলেও তার তো ঘুম হচ্ছে। অন্যথায় দু'টি পেরেশানী একত্রিত হতো। একটি হলো আমার ঘুম না হওয়ার এবং অপরটি তার ঘুম না হওয়ার।

ঘর হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই, কোন জরুরী কাজ আমার করণীয় নেই তো ? আমি বের হয়ে যাচ্ছি। যদি সে বলে, কোন কাজ নেই, তাহলে বের হয়ে যাই। আর যদি বলে, কোন কাজ আছে, তাহলে উক্ত কাজ সম্পন্ন না করে বের হই না। হোক না তা চিঠি লেখানোর কাজ।

খাবার শেষ করে পান খেতে ইচ্ছে হলো। তখন তাকে পান এনে দেয়ার হুকুম না করে জিজ্ঞেস করে নেই, পানদান কোথায় ? অতঃপর তা থেকে নিজ হাতে পান বের করে খাই।

আজকাল যুবক শ্রেণীর পরিভাষা হলো, স্ত্রীকে জীবনসঙ্গিনী বলা। অথচ বাস্তবে জীবনসঙ্গিনীর হক আদায় করবে তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মানুষের হকও আদায় করে না। আসলে এগুলো অন্তঃসারশূন্য শব্দ ব্যতীত কিছুই নয়। কারণ, বাস্তব আচরণ থেকে তো মনে হয় যেন স্ত্রী জীবনসঙ্গিনী নয় বরং জীবনের দুশমন।

পরশু দিনের ঘটনা, আমি ফজরের নামাজের দু'রাকা'আত সুন্নাত পড়ছিলাম। তখন বড় ঘর হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, আমার স্ত্রী ঘরের সিলিং হতে পড়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ নামাজ ছেড়ে ছুটে গেলাম। এখানে তো সকলে বিবেকবান, কিন্তু কোন কোন মূর্খ লোক হয়ত মনে মনে বলছে, আফসোস! স্ত্রীর জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রীর প্রতি এত দুর্বল যে, তার জন্য আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে! কোন দুনিয়াদার পীর হলে নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় কিছুতেই নামাজ ছাড়তো না। কারণ, এর দ্বারা জাহেল মুরীদদের মন বিগড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু আমি আলহামদুলিল্লাহ! কে কি বলবে না বলবে, তার পরোয়া করি না। এর কারণে কারো মনে প্রশ্ন হলে তার জন্য অন্য পীর গ্রহণ করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার আছে।

এ অবস্থায় নামাজ ছেড়ে দেয়া যখন আল্লাহর হুকুম, তখন আমার কি করার আছে। জাহেল-মূর্খদের কাছে বড় থাকার জন্য আমি কি আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দেব ?

স্ত্রী পড়ে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার পর একমাত্র স্বামীই তার ব্যথার উপশম করতে পারে। স্বামীই কেবল জিজ্ঞেস করতে পারে, ব্যথা কোথায় পেয়েছে এবং কোথায় পায়নি। বিশেষত এমন অবস্থায়, যখন ঘরে একটি অবুঝ শিশু ও

একজন মাযূর বৃদ্ধা ছাড়া সাহায্য করার মত আর কেউ ছিলো না। আর সাহায্যকারী কেউ থাকলেও উপর হতে পড়ে যাওয়া কখনও কখনও মৃত্যুর কারণও তো হতে পারে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার ফলে আল্লাহ তার জীবন রক্ষা করতে পারেন। এ কারণেও আমার সাথে সাথে যাওয়া আবশ্যক ছিলো। তাই আমি নামাজ ছেড়ে দিয়ে সাথে সাথে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া শরয়ী দিক থেকে জরুরী মনে করেছি।

হাদীস শরীফে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দানরত অবস্থায় হযরত হাসান ও হোসাইন (রা)-এর মধ্য হতে কোন একজন মসজিদে চলে এলেন। তখন তাঁরা ছিলেন ছোট্ট শিশু, হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা ছেড়ে দিয়ে দূর থেকেই তাকে কোলে টেনে নিলেন। অথচ খুৎবা নামাজের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, খুৎবা ও নামাজের হুকুম অভিন্ন, যা কঠিন কোন ওযর ছাড়া ছেড়ে দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় দৌহিত্রের দাঁড়ানো থেকে পড়ে যাওয়ার আশংকায় খুৎবা ছেড়ে দিলেন। তাহলে আমি এমন কী হয়ে গেলাম যে, স্ত্রীর এত বড় একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও সুন্নাত নামাজের নিয়ত ছাড়বো না।

আমার এ ঘটনা থেকে কেউ যেন এটা না বুঝে যে, আমি স্ত্রীকে নামাজের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। বরং আল্লাহর হুকুমকে গুরুত্ব দিয়েছি। কেননা সে সময় আল্লাহর হুকুম এটাই ছিলো। আল্লাহর হুকুমের সামনে স্ত্রী আবার কি? আল্লাহ তা'আলা যদি কখনও স্ত্রীকে হত্যা করার হুকুম দেন, তখন প্রকৃত মু'মিন তাই করবে। আর যখন তিনি স্ত্রীর খোঁজ-খবর রাখার হুকুম করবেন, তখন সে উক্ত হুকুম পালনের জন্য প্রয়োজনবোধে নামাজও ছেড়ে দিবে। উভয় ক্ষেত্রেই উভয় কাজেরই কারণ আল্লাহ তা'আলার হুকুম রক্ষা করা।

স্ত্রীর প্রতি মহব্বতের সীমারেখা

জনৈক বন্ধু আমাকে লিখলো, স্ত্রীর প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত। এ পরিমাণ মহব্বত শরীয়তে নিন্দনীয় কিনা ? জবাবে আমি তাকে লিখলাম, স্ত্রীর প্রতি এর চেয়ে আরো অধিক মহব্বত হলেও শর্ত সাপেক্ষে তা দূষণীয় নয়। অতঃপর তার কাছে প্রশ্ন রাখলাম, যদি কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে সে কোনটিকে প্রাধান্য দিবে ? স্ত্রীকে নাকি দ্বীনকে ? যদি স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এ মহব্বত নিন্দনীয়। আর যদি দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এ মহব্বত প্রশংসনীয়।

অতঃপর বললাম, অসহায় স্ত্রীকেই বা কেন অনুশীলনের পাত্র বানানো হচ্ছে? যদি স্ত্রী গায়রুল্লাহ্ হওয়ার কারণে তার প্রতি মহব্বতের ব্যাপারে সন্দেহের সূত্রপাত হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেও তো আইনুল্লাহ (স্বয়ং আল্লাহ) নয়, বরং গায়রুল্লাহ। স্ত্রীর প্রতি যে মহব্বতের কারণে সন্দেহের জন্ম হলো, সেই মহব্বত যদি স্বয়ং নিজের প্রতি হতো, তাহলে সেখানেও তো প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া উচিত। অথচ সেখানে তো কোন প্রশ্ন হচ্ছে না। তবে প্রশ্ন যে হয়েছে, এটাও ভালো লক্ষণ। এর দ্বারা দ্বীনের ফিকির (চিন্তা)তো অন্তত জাগ্রত হবে। আর দ্বীনের ফিকির এমন বস্তু, যা সৃষ্টি হলে মুসলিহ্ (সংশোধনকারী)-এর দায়িত্ব হলো তা বলে দেয়া, শিখিয়ে দেয়া।

তবে স্ত্রীকে মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত করতে গিয়ে তাকে মাথায় তুলে নেয়াও চরম নির্বুদ্ধিতা। জনৈক ভদ্রলোকের কথা আমি জানি, সে তার মহৎ চরিত্র ও নম্র-কোমল স্বভাবের কারণে কখনও কখনও স্ত্রীর হাতের পিটুনি খেতো। স্ত্রীর হাতে পিটুনি খাওয়া তো বড় খারাপ কথা। তার নম্র কোমল স্বভাব ও মহৎ চরিত্রগুণের কারণেই আল্লাহ উক্ত মহিলাকে রক্ষা করেছেন। অন্যথায় সে স্ত্রীর একটির বিনিময়ে তাকে দুটি লাগাতো। স্বামীর গায়ে হাত উঠানো এটা তো চরম বে-আদবী। তবে এ বে-আদবীর জন্য কারণ স্বামী নিজেই। কেননা সে স্ত্রীকে এতটুকু প্রশ্রয় দিয়েছিলো বলেই সে এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। স্ত্রীর হাতে পিটুনি খাওয়ার চেয়ে লজ্জাজনক, অবমাননাকর ও দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে?

আমি যা বলতে চাই, তা হলো, স্ত্রীর স্পর্ধা এতটুকু বাড়িয়ে দেয়াও উচিত নয় যে, স্বামী তার সামনে বিলকুল বেকুফ বনে থাকবে। নিরবে তার কিল-ঘুষি ও মার-পিট সয়ে যাবে। আবার এটাও উচিত নয় যে, স্বামী ঘরে পা রাখা মাত্রই স্ত্রী ভয়ে-আতংকে থরথর করে কাঁপবে। হুঁশ-জ্ঞানহারা হয়ে সে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। বেচারী কোন শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র, কোন কিছু চাওয়া মাত্র হুমকি-ধমকি শুরু হয়ে যাবে।

আমার কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বাধা-বন্ধনহীন ভাবে মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে দিবে এবং সংশোধনের চেষ্টা করবে না। সংশোধন তো অবশ্যই তাকে করতে হবে। তবে তা হতে হবে নম্রতা, কোমলতা, হিতকামনা ও আন্তরিকতার সাথে। একান্ত প্রয়োজনবোধে দু'একটি হুমকি-ধমকি দেয়াও দূষনীয় নয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা আরোপ এবং অতিরিক্ত হুমকি-ধমকির মাধ্যমে তাকে সর্বদা উত্তেজিত করে তোলা তো কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বামী-স্ত্রী বিরোধ

স্বামী-স্ত্রী বিরোধ দাম্পত্য জীবনে হাজারো ফিৎনা-ফাসাদের জন্ম দেয়। শয়তান ঐ ব্যক্তির প্রতি খুবই খুশী হয়, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ বাধিয়ে দেয়।

হাদীস শরীফে আছে, শয়তান সন্ধ্যায় সমুদ্রের উপর তার সিংহাসনে আরোহণ করে। তখন তার সমস্ত ভক্ত-অনুগতরা একত্রিত হয়ে নিজ নিজ কার্যবিবরণী শুনাতে থাকে। কেউ বলে, আমি এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত করেছি। তখন শয়তান সকলকে লক্ষ্য করে বলে, তোমরা কিছুই করতে পারনি। কারণ একবার তাওবা ও ইসতিগ্‌ফার দ্বারা সমস্ত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। অতঃপর আরেকজন বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন স্থায়ী ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে। শয়তান তাকে বুকে জড়িয়ে নেয় এবং তাকে বিপুল ভাবে উৎসাহিত করে বলে, হাঁ! তুমিই বিরাট কাজ করেছ।

এখানে রহস্য এই যে, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ ও শত্রুতা সৃষ্টি হলে তার প্রভাব শুধু উক্ত দু'ব্যক্তিকেই স্পর্শ করে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বিরোধ কিংবা পারস্পরিক ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেলে তার জের বহু দূর পর্যন্ত চলে যায়। উভয়ের পরিবারে পরিবারে দ্বন্দ্ব-কলহ ও সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। মোটকথা, দু'জনের বিভেদ থেকে শত মানুষের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত স্থায়ী রূপ লাভ করে। শয়তানের এত সময় কোথায় যে, শত মানুষের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধিয়ে দিবে। এজন্য শয়তান এমন দু'ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে দেয়, যার ধারাবাহিকতা বহু দূর পর্যন্ত চলতে থাকে।

যেমন, এক শিক্ষানবিসের ঘটনা, সে যখন আরবী পড়া শুরু করলো তখন শুরুতেই শরহে জামী (আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) নিয়ে বসলো। কয়েক বছর যাবৎ তা পড়ার কসরত অব্যাহত রাখলো। কিন্তু কিছুই হাসিল হলো না। লোকজন বললো, বেকুফ! এভাবে শুরুতেই শরহে জামী নিয়ে কি ফায়দা হবে ? প্রথমে মীযান, মুনশাইব ও প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়ে নাও। তাহলে শরহে জামী বুঝতে পারবে।

সে বলতে লাগলো, না, আমি আমার মাকে মুরগী পালতে দেখেছি। আমি সন্ধ্যায় মুরগীর বাচ্চাগুলোকে ধরে আটকাতে চাইতাম। কিন্তু সেগুলো আমাকে খুবই বিরক্ত করতো। কোনটি এদিক, কোনটি ওদিক ছুটে যেতো। তখন আমার মা বড় মুরগীটি ধরে ফেলতেন। ফলে সমস্ত বাচ্চা কিচির মিচির করে দৌড়ে তার ডানার নীচে চলে আসতো।

অনুরূপ "শরহে জামী" কিতাবটি অন্য সমস্ত কিতাবের জন্য বড় মুরগীতুল্য। আমি তা আয়ত্ত করতে পারলে অন্য সমস্ত কিতাব নিজে নিজেই আমার আয়ত্তে এসে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ-বিশৃংখলাও অন্য সমস্ত বিশৃংখলার জন্য বড় মুরগীতুল্য। তাই শয়তান তাদের মধ্যে ঝগড়া ও বিশৃংখলা বাধিয়ে দিতে অধিক তৎপর থাকে। যেন তা থেকে অসংখ্য ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং তা দ্বারা মানুষের দ্বীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্নকারীদের মধ্যে আরেকটি নতুন পেরেশানী এই সৃষ্টি হয় যে, একজন অপরজনের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবে কি করবে না।

মহিলাদের একটি বড় ক্রুটি এই যে, তারা স্বামীর যথাযথ সম্মান ও তার আদব রক্ষা করে চলে না। এটা বড়ই নির্লজ্জতার কথা। অনেকে স্বামীর সাথে এমন সমকক্ষসুলভ আচরণ করে, যেন সে তার সমতুল্য। অথচ শরীয়তে স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তাকীদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে নারীদেরকে হুকুম দিতাম যেন নিজ স্বামীকে সিজদা করে।" কিন্তু সিজদা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত বিধায় নারীদের প্রতি সে হুকুম হয়নি। তবে হাদীস একথা তো নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর কাছে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান পাবার হকদার একমাত্র স্বামী।

কোথাও কোথাও তো স্ত্রী স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখার চেষ্টা করে। তাকে সম্পূর্ণ নিজের বশীভূত ও অনুগত করে রাখে। আবার অনেক পুরুষও এমন অত্যাচারী যে, স্ত্রীকে সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে রাখে। বিভিন্নভাবে স্ত্রীর হক নষ্ট করে। নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করে। ভালো খায়, ভালো পরে। কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দুঃখে, কষ্টে রাখে। কারো সম্পদ না থাকলে তার কথা ভিন্ন। এ অবস্থায়ও স্ত্রী নিজে মেহ্নত করে উপার্জন করে স্বামীকে খাওয়ায়, স্বামীর জন্য নিজের অলংকার পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। কিন্তু যাকে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দিয়েছেন, তার স্ত্রীকে কষ্টের মধ্যে রাখা বড়ই নির্দয়তা ও নির্লজ্জতার কথা।

বর্তমানে নারীদের উপর জুলুম-নিপীড়ন এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, যেন তাদের উপর স্বামীর পরিপূর্ণ হক এবং স্বামীর উপর তাদের কোন হকই নেই। অনেক জায়গায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই জুলুম-নির্যাতন হচ্ছে। কিয়ামত দিবসে এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যার দ্বারা যার হক নষ্ট হলো, তার থেকে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে।

সুতরাং স্বামীর উচিত স্ত্রীর হকের প্রতি পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য রাখা এবং স্ত্রীর উচিত স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করে চলা; তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

মহিলাদের আরেকটি বড় রোগ হলো, তারা স্বামীর নাফরমানী করে, তার হুকুম অমান্য করে চলে। যদিও কোন কোন পুরুষও স্ত্রীর উপর জুলুম করে, তার হক আদায়ে ত্রুটি করে। কিন্তু স্বামীর পক্ষ হতে সুন্দর আচরণ সত্ত্বেও অনেক মহিলা স্বামীকে কষ্ট দিতে থাকে।

আমি এ অঞ্চলের মহিলাদের স্বামীর প্রতি খিদমতকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু এ খিদমতের নির্যাস হলো, স্বামীকে দৈহিক আরাম দেয়া এবং আত্মিক কষ্ট দেয়া। স্বামীর দৈহিক খিদমত তো বাস্তবিকই অনেকে করে। এক্ষেত্রে তাদের কোন তুলনা নেই। অনুরূপ পূত পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষায়ও তাদের কোন তুলনা হয় না। কিন্তু মুখ তাদের এমন অসংযত যে, যা মুখে আসে তাই দ্বিধাহীনভাবে স্বামীকে বলে ফেলে। ফলে স্বামী সীমাহীন কষ্ট পায়।

এ অবস্থা সংশোধনের সহজ পন্থা হলো, মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা। প্রথম প্রথম এটা খুবই কষ্টসাধ্য হলেও অচিরেই যখন তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, তখন এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সহজ হয়ে যাবে। যথার্থ চিকিৎসা এটাই। স্বামীকে লবণ পড়া, চিনিপড়া খাইয়ে বশে এনে তাকে নিস্তব্ধ করে দেয়া এবং তাকে যা ইচ্ছা তা বলার ক্ষমতা লাভ করা কোন সমাধান নয়।

অনেকে তো স্বামীর প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে থাকে যে, স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করাকে না-জায়েয ও বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ মনে করে। "স্বামীর নাম উচ্চারণ করা বে-আদবী" আর তার সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, অশালীন আচরণ করা কি বে-আদবী নয় ? কি অদ্ভুত ব্যাপার। স্বামীর নাম উচ্চারণ করলে বে-আদবী হয়ে যাবে, অথচ তার সাথে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া, তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করা যেন দূষণীয় নয়। অনেক মহিলা তো কুরআন শরীফে স্বামীর নাম এলে তা উচ্চারণ করাকেও

না-জায়েয মনে করে। যেন কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে তার স্বামীর নামই উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনেকে বে-আদবী হয়ে যাওয়ার আশংকায় স্বামীর এলাকার নাম এমনকি স্বামীর নামের সমোচ্চারিত শব্দও মুখে উচ্চারণ করতে রাজী নয়। অথচ তারা একথা ভেবে দেখে না যে, স্বামীর নাম ও তার এলাকার নাম উচ্চারণ করা না-জায়েয হলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাকে অশালীন উক্তি করা জায়েয হয় কিভাবে?

স্বামীকে নম্র-কোমল বানানোর ব্যবস্থা

এক মহিলা জনৈক বুযুর্গের নিকট এসে বললো, হযরত! আমাকে এমন একটি তাবীজ দিন, যা ব্যবহার করলে আমার স্বামী আমার প্রতি নম্র-কোমল হয়ে যাবে। উক্ত বুযুর্গ কিছু পানি নিয়ে তাতে কোন কিছু না পড়ে তাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এ পানি বোতলে রেখে দিবে। যখন তোমার স্বামী ঘরে আসবে, তখন এ পানি হতে সামান্য কিছু মুখে নিয়ে বসে থাকবে এবং সে ঘর থেকে না যাওয়া পর্যন্ত পানি মুখেই রাখবে। ফলে তোমার স্বামী পানির মত হয়ে যাবে।

মহিলা তাই করলো। স্বামী যখন ঘরে আসতো, সে বোতলের মুখ খুলে কিছু পানি মুখে নিয়ে বসে থাকতো, ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্বামী তার প্রতি অত্যন্ত নম্র-কোমল হয়ে গেলো।

তখন মহিলাটি কিছু নযরানা নিয়ে উক্ত বুযুর্গের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হযরত! আমার স্বামী এখন আর আমাকে কঠিন কোন কথা বলে না। আমার প্রতি অত্যন্ত নম্র-কোমল ও সদয় হয়ে গেছে।

বুযুর্গ তখন মুচকি হেসে বললেন, "সেটা তো একটা কৌশল ছিলো। ঝাড়-ফুঁক বলতে কিছুই ছিলো না। তোমার আচরণ থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তুমি তোমার স্বামীর প্রতি রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ করতে। ফলে সেও তোমার উপর কঠোরতা করতো। তাই আমি তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য এ কৌশল গ্রহণ করেছিলাম। যাও, এখন থেকে আর স্বামীর সাথে রুক্ষ ভাষায় কথা বলবেনা। আর তোমার এ টাকা ও মিষ্টি আমি গ্রহণ করলাম না। তা তুমি নিয়ে যাও।" বাস্তবিকই মানুষের মুখের ভাষা বড়ই বিপদ জনক। মুখের ভাষার কারণেই অনেক বিপত্তি ঘটে।

স্বামীর ক্রোধের সময় স্ত্রীর কি করণীয়

স্বামীর ক্রোধের সময় স্ত্রীর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। স্বামীর ক্রোধের কারণে স্ত্রীর ক্রুদ্ধ হওয়া প্রমাণ করে যে, সে নিজেকে স্বামীর চেয়ে বড় কিংবা তার

সমকক্ষ মনে করে। কেননা ক্রোধ সর্বদা নিজের চেয়ে ছোট বা নিজের সমকক্ষের উপর এসে থাকে। মানুষ যাকে নিজের চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে, তার উপর কখনও ক্রুদ্ধ হয় না। যেমন– মনিবের উপর গৃহভৃত্য কখনও ক্রুদ্ধ হয় না।

স্ত্রী যদি নিজেকে স্বামীর চেয়ে অধম বা তার অনুগত মনে করে, তাহলে স্বামী যতই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হোক না কেন, স্ত্রী তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হতে পারে না।

সুতরাং "স্ত্রী স্বামীর সমকক্ষ" এ ভ্রান্ত চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অন্তর থেকে মুছে ফেলা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যেমন নারীকে স্বামীর অধীন বানিয়ে দিয়েছেন, তেমনি তাকে স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে নেয়া এবং নিজেকে স্বামীর চেয়ে অধম মনে করা উচিত। স্বামীর ক্রোধের সময় নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখবে– তার ক্রোধের পেছনে কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক। অতঃপর স্বামীর ক্রোধ যখন নিস্তেজ ও অবদমিত হয়ে যাবে, তখন সুযোগ বুঝে বলা যেতে পারে যে, "আমি সে সময় নিশ্চুপ ছিলাম। এখন বলছি, আপনি আমার উপর অকারণে উত্তেজিত হয়েছেন। আপনার এ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া অহেতুক ছিলো।"

ফলে কথা কাটাকাটি বৃদ্ধি পাবে না বরং স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি স্বামীর ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে এটা চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তা'আলারও তো আমাদের উপর অনেক হক রয়েছে, এবং আমরা তাঁর সাথে ভুল করেই চলছি। তিনি যখন আমাদেরকে ক্ষমা করে যাচ্ছেন। তাহলে আমাদেরও উচিত স্বামীর ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। এভাবে নিজেকে সংযত রাখার ফলে দ্বীনের বিরাট কল্যাণ সাধিত হয় এবং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অনেক প্রতিদানও পাওয়া যায়।

নারীরা প্রকৃতিগত ও নীতিগতভাবে পুরুষের অনুগত। কিন্তু কখনও কখনও পুরুষ অতিরিক্ত মহব্বতের কারণে স্ত্রীর অনুগত বনে যায়। এজন্য স্ত্রীর উচিত সর্বদা সদাচরণের মাধ্যমে স্বামীর অন্তরকে জয় করে নেয়া। যেন তার অন্তরে স্ত্রীর প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। স্ত্রীর প্রতি স্বামী ততক্ষণ পর্যন্ত অনুগত থাকে, যতক্ষণ তার অন্তরে স্ত্রীর মহব্বত অবশিষ্ট থাকে। আর মহব্বত অবশিষ্ট থাকার জন্য পূর্বশর্ত হলো, স্ত্রী পরিপূর্ণ পরদার সাথে চলা। কেননা স্ত্রীকে আরাম ও শান্তি পৌঁছানোর যে দায়িত্বানুভূতি থাকে, তার উৎস হলো স্ত্রীর প্রতি মহব্বত। আর কোন বস্তুর প্রতি অতি মহব্বত তখনি সৃষ্টি হয়, যদি তা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। আর স্ত্রী সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকতে পারে

পরদার সাথে চলার মাধ্যমে। বাস্তব-অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে বস্তু প্রকাশ্যে ও দৃশ্যপটে থাকে, তার প্রতি মানুষ আকর্ষণ বোধ করে না। এজন্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মহব্বত অটুট থাকার পূর্ব শর্ত হলো পরিপূর্ণ পরদার সাথে চলা। পরদাহীন নারীর প্রতি স্বামীর পূর্ণ মহব্বত কখনও অটুট থাকতে পারে না।

স্বামীকে বশীভূত করার তদবীর

ফিকাহবিদগণ এ জাতীয় তাবীজ লেখাকে না-জায়েয বলেছেন, যার মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত করে। স্বামী-স্ত্রী মহব্বতের জন্য তাবীজ কবজ করা স্ত্রীর জন্য হারাম। কেননা এ জাতীয় তাবীজের প্রভাবে স্ত্রীর জন্য স্বামী এমন কাজ করতে বাধ্য হয়, যা তার উপর ওয়াজিব নয়। এজন্য স্বামীকে বশীভূত করার জন্য কুরআনের আয়াত বা অন্য কোন দোয়া দ্বারা তদবীর করা জায়েয নেই। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেয়ার জন্য দোয়া তাবীজের আশ্রয় নিতে পারে। স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে তাকে বশে আনার জন্যও দোয়া-তাবীজ প্রয়োগ করা জায়েয। এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীর প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে থাকলে তাকে তার জুলুম-অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করার জন্যও তাবীজ-কবজ প্রয়োগ করা জায়েয।

কিন্তু দোয়া-তাবীজের কিছু কিছু পদ্ধতি এমন আছে, যেগুলো বড়ই স্পর্শকাতর। সাধারণত সেগুলোকে জায়েয মনে করা হলেও ফিকাহবিদগণ হারাম সাব্যস্ত করছেন। যেমন, স্ত্রীর হক আদায়ে স্বামী ত্রুটি করলে দোয়া-তাবীজ প্রয়োগ করা স্ত্রীর জন্য জায়েয। স্বামী স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি না করলে শুধু স্বামীকে নিজের প্রতি আসক্ত করার জন্য জায়েয নেই।

স্বামী-স্ত্রী মহব্বতের কয়েকটি আমল

স্বামীকে সন্তুষ্ট করার আমল ঃ

যদি কারো স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে চিনির উপর দম করে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তবে না জায়েয ক্ষেত্রে এ আমল ফলদায়ক হবে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ـ

স্ত্রীর মহব্বত লাভের আমল ঃ

(১) স্বামীর প্রতি যদি স্ত্রীর মহব্বত কম থাকে, তাহলে সূরায়ে ইউসুফ লিখে তাবীজ বানিয়ে হাতের বাজুতে ব্যবহার করলে তার প্রতি স্ত্রীর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

(২) স্ত্রী সহবাসের সময় اَلْمُغْنِىْ শব্দটি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়তে থাকলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

স্বামী-স্ত্রী মহব্বত সৃষ্টির আমল ঃ

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখে কিংবা তা পড়ে কোন খাদ্যদ্রব্যে দম করে খাওয়ালে অথবা পান করালে ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে আপোষের মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ اَلِّفْ بَيْنَ .... فُلَانِ بْنِ .... فُلَانٍ .... وَفُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَةَ .... كَمَا اَلَّفْتَ بَيْنَ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ـ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ ـ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ

فلان এর স্থলে স্বামী ও তার পিতার নাম এবং فلانة এর স্থলে স্ত্রী ও তার মায়ের নাম লিখবে।

তবে না-জায়েয ক্ষেত্রে এ তদবীর প্রয়োগ করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির আশংকা অধিক। এক ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে না-জায়েয ক্ষেত্রে এ তদবীর প্রয়োগ করেছিল। ফলে তার উপকার তো হয়ই নি বরং বিরাট ক্ষতি হয়েছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা

বর্তমান অবস্থা হলো, স্বামী তো স্ত্রীর কাছ থেকে তার হক ষোল আনার স্থলে আঠার আনা আদায় করে ছাড়ে। কিন্তু নিজে স্ত্রীর হক আদায় করবে তো দূরের কথা, তার উপর স্ত্রীর কোন হক আছে বলেও মনে করে না।

যেমন, অনেক পিতা-মাতা আপন সন্তান-সন্ততি থেকে তাদের সম্পূর্ণ হক আদায় করে নিতে কোনই কসূর করে না। কিন্তু তাদের উপরও যে সন্তানের কিছু হক রয়েছে, তা তাদের আচরণ থেকে বুঝে আসে না।

এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, শাসক নিজেকে জীবিত মনে করে এবং শাসিতকে মৃত মনে করে। ফলে শাসকের হক তো কড়ায়-গণ্ডায় আদায় হয়ে যায়। আর শাসিতের হক অবহেলার আবর্তে ঢাকা পড়ে যায়। এজন্যই অধিকাংশ রাজা-বাদশাগণ প্রজা-সাধারণ থেকে নিজেদের অধিকার তো তিলে তিলে আদায় করে নেয়। কিন্তু প্রজা সাধারণের অধিকারসমূহ উপেক্ষিত হতে থাকে। তাদের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছুই অবহেলিত হয়। এভাবে রাজা-বাদশাদের থেকে নিয়ে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত শাসক শ্রেণী নিজেদের অধিকার ও কল্যাণ সাধনে সদা সচেষ্ট থাকে। কিন্তু শাসিতদের অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। পিতার শাসন-কর্তৃত্ব পুত্রের উপর, স্বামীর শাসন কর্তৃত্ব স্ত্রীর উপর, মনিবের শাসন-কর্তৃত্ব ভৃত্যের উপর, শিক্ষকের শাসন কর্তৃত্ব ছাত্রের উপর, পীরের শাসন-কর্তৃত্ব মুরীদের উপর তথা প্রতিটি স্তরেই এক অবস্থা বিরাজমান। যে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়, সে আপন অধিকার পরিপূর্ণরূপে আদায় করে নিতে সোচ্চার থাকে। আর যার উপর শাসন কর্তৃত্ব চলে, সে অবহেলিতই থেকে যায়। তার অধিকারকে অধিকারই মনে করা হয় না। কারণ, সে আপন অধিকার আদায় করে নেয়ার ক্ষমতা রাখে না। হাঁ! যারা শাসকের সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে এবং শক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে সক্ষম, তাদের অধিকার কিছুটা আদায় হয় বটে।

প্রবাদ রয়েছে, "লাঠি যার মহিষ তার।" স্বামী মনে করে তার হক জীবিত। কারণ, সে তা আদায় করে নিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অসহায় স্ত্রী যেহেতু তার হক আদায় করতে সক্ষম নয়, তাই তার হককে মৃত মনে করা হয়।

অথচ ইসলাম এ জাতীয় মৃত হক আদায় করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। হাদীস শরীফে আছে, "যে হক সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা– এমন কি হকদারও না, তার দাবীদার স্বয়ং আল্লাহ নিজে।" হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে, যার কোন সাহায্যকারী নেই, তার সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ। এজন্যই মাজলুমের দো'আ আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয় না। মাজলুম যখন ফরিয়াদ করে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ

لَاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ

"অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছু বিলম্বে।"

স্ত্রীর খরচ প্রদানে সংকীর্ণতা

অনেকে স্ত্রীর আবশ্যকীয় খরচ ও খাওয়া-পরা ইত্যাদিতেও সংকীর্ণতা করে থাকে। স্ত্রী কোন জিনিস চাওয়া মাত্র হুমকি-ধমকি শুরু হয়ে যায় যে, "তুমি বহু অপচয় কর, এটার কি প্রয়োজন ? ওটার কি প্রয়োজন ?" স্ত্রীর খরচ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। পূর্বে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে এক পয়সাও বেশি দিতে রাজী নয়। চাই কোন মেহ্মান আসুক বা কেউ অসুস্থ হোক। বিশেষ প্রয়োজনবশত স্ত্রী অতিরিক্ত খরচ দাবী করলে তাকে শাসিয়ে দেয় যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক দিতে পারবো না।

ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা স্বামীর আন্তরিকতা চায়। তথাকথিত নিয়ম-কানুন চায় না। খরচের ব্যাপারে এতই নিয়মনিষ্ঠ হলে নিজে তা পালন করে দেখানো উচিত যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক কোন অবস্থাতেই খরচ করবে না। চাই অসুস্থ হও কিংবা নতুন কোন বিবাহ-অনুষ্ঠান হোক বা অন্য কোন বিপদ-আপদ আপতিত হোক। হঠাৎ যদি মাথার উপর কোন মামলা-মোকদ্দমা এসে যায়, তখন দেখা যাবে কতটুকু নিয়ম মেনে থাকতে পারো। সমস্ত নিয়ম-কানুন তখন যথাস্থানে থেকে যাবে। হাজার হাজার টাকা পানির ন্যায় খরচ হয়ে যাবে। তাহলে অসহায় স্ত্রীর সাথে তার খরচ প্রদানে এত নিয়মকানুন কেন ?

সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা, তাকে দ্বীন ও শরীয়ত শিক্ষা দেয়া এবং দ্বীনের উপর পরিচালিত করা তার একটি অন্যতম অধিকার। অনেকে স্ত্রীকে নিয়মিত ভরণ-পোষণ প্রদানে চরম অবহেলা করে এবং তাতে মাত্রাতিরিক্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেখে অন্য কোন অসৎ নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তার পেছনে নিজের অর্থ-সম্পদ সবকিছু উজাড় করে দেয়। নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনষ্ট হওয়ার এবং জীবন কলংকময়

হওয়ার কোনই পরোয়া করে না। যেন তার বুদ্ধি ও বিবেকের উপর পরদা পড়ে গেছে এবং অসৎ কামনা চরিতার্থ করার জন্য সে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে।

অনেককে দেখা যায়, নিজে সুখ-সাচ্ছন্দে থাকে। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাকে তার বিলাসিতার অন্ত নেই। অথচ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি অনাহারে অর্ধাহারে চরম দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করে। স্ত্রী বাঁদী-দাসীর মত মানবেতর জীবন যাপন করবে, আর নিজে বিলাসিতা করবে, এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে ? স্ত্রীর কাপড়-চোপড়ের খবর রাখবে না, তার খাবারের খোঁজ নিবে না– এটা কেমন কথা? অথচ পোশাক-আশাক ও সাজ-সজ্জার যথোপযুক্ত পাত্র তো স্ত্রী। পুরুষের জন্য আবার কিসের সাজসজ্জা?

কোন কোন পুরুষ তো এমন ঘৃণিত চরিত্রের যে, নিজের ঘরে হুরের মত সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অসৎ পরনারীদেরকে নিয়ে মশগুল থাকে। তাদের সাথেই তার দহ্‌রম-মহরম। অথচ তার সুন্দরী স্ত্রী গৃহে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। তার প্রতি সে ভ্রূক্ষেপও করে না।

ভারতবর্ষের নারীদেরকে আল্লাহ এমনি ধৈর্য, সহনশীলতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ দান করেছেন যে, স্বামীর এমন নির্দয় ও অমানবিক আচরণ সত্ত্বেও নীরবে শুধু অশ্রু বিসর্জন দেয়। স্বামীর গোপন ভেদ কারো কাছে প্রকাশ করে না।

এক নির্যাতিতা নারীর কাহিনী

নারীদের উপর বড়ই নির্যাতন চলছে। আজ এক নারীর চিঠি পেলাম। প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ আমার সাথে তার ইসলাহী সম্পর্ক। মহিলাটি খুবই ধর্মপরায়ণ। স্বামীর অত্যাচার ও নির্দয়তার কাহিনী সে আমাকে লিখেছে। তার চিঠির বিবরণ দেখে আমি সীমাহীন ব্যথিত হয়েছি।

নারীদের অধিকার আদায়ে মানুষ সীমাহীন অন্যায় করছে। অসহায় মহিলাটি এতটুকু পর্যন্ত লিখেছে যে, "নীরবে কাঁদতে কাঁদতে আমার দৃষ্টি শক্তি প্রায় বিলুপ্তির পথে। কখনও মন চায়, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। কিংবা পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করি। কিন্তু দ্বীন ও শরীয়তের কথা চিন্তা করে কিছুই করতে পারছিনা। মনকে প্রবোধ দিয়ে নিবৃত্ত হয়ে যাই। রাত-দিন শুধু কান্না আর কান্না ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।"

বড়ই অন্যায় কথা। আসলেও নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়া ছাড়া অসহায় মহিলাটির আর কি-ই-বা করার আছে ?

প্রায় সতের বছর আগে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে। স্বামী খুবই আগ্রহ দেখিয়ে তাকে বিবাহ করেছিল। তখন তার রং রূপ ছিলো, চেহারায় জৌলুস ও লাবণ্য ছিলো। তখন তো তাকে কাছে পাওয়ার জন্য লোকটি তার কাছে ধর্না দিয়ে ফিরতো। কিন্তু এখন আর তার সেই রং রূপ ও জৌলুস নেই। বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়েছে। তার দিকে এখন আর মুখ ফেরানো তো দূরের কথা তাকে ভরণ-পোষণ থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত রেখেছে।

মহিলাটি বয়সে তার চেয়ে বড়। বিবাহের পর থেকে নিয়ে এ সতের বছর যাবৎ সে তার হক কতটুকু আদায় করেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। লোকটি এতই নিষ্ঠুর প্রকৃতির যে, মহিলার কোন কথায়ই সে কর্ণপাত করতো না। মহিলাটি যদি বলতো, তোমার জন্য আমার এতদিনের খিদমত ও সেবা যত্নের এই পরিণাম ? তখন সে বলতো, তুমি আমার খিদমতই বা কি করেছো ? কে জানে তার কাছে খিদমতের সংজ্ঞা কি, যা স্ত্রী আদায় করতে পারেনি।

স্বামী কর্তৃক এ সমস্ত নির্যাতিতা নারীদের অধিকার সম্পর্কে আমি অচিরেই একটি কিতাব লিখবো। অপরের উপর শাসন চালাতে তো বড় ভালো লাগে। এটা দূষণীয়ও নয়। কিন্তু শাসিতের কিছু হুকুক বা অধিকারও তো রয়েছে। সেগুলো পূরণ করাও তো জরুরী।

আল্লাহ্ যদি আমার হাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা দান করতেন, তাহলে আমি সর্বপ্রথম এ ঘোষণা দিতাম— যে সমস্ত নারী স্বামীর নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার, তারা যেন আমার কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করে। আমি সুষ্ঠু তদন্ত চালিয়ে তাদেরকে স্বামীর নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত হতে উদ্ধার করবো।

জনৈক ইলম ও তাকওয়াধারী ব্যক্তির কথা আমি জানি। সে স্ত্রীর উপর খুবই নির্যাতন-দুঃশাসন চালাতো। পরিণামে স্ত্রী তাকে "শূয়রের বাচ্চা" পর্যন্ত বলে ফেলতো। আর আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্ত্রীর প্রতি আমার মহৎ আচরণের ফল এই যে, আমাকে সে পীর সাহেব মনে করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহীয়সী স্ত্রীগণের প্রতি এরূপ মহৎ আচরণই করতেন।

স্ত্রীর উপর জুলুম করা কাপুরুষতা

স্ত্রীর উপর জুলুম-নির্যাতন চালানো কাপুরুষের কাজ। কারণ, নারীরা পুরুষদের কাছে জীবিতের হাতে মৃতের ন্যায়। তাদের উপর জুলুম চালালে কি কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে ? বীরত্ব প্রকাশ ও অপরের উপর শাসন চালানোর খাহেশ থাকলে কোন শক্তিশালী পুরুষের উপর শাসন চালিয়ে দেখাও তো দেখি।

তখন আমরা বীর পুরুষ হিসাবে মেনে নেবো। ঘরে যদি কোন উগ্র মেজাজের চাকর থাকে, তাকে সামান্য কিছু বলে দেখো, শাসন করার স্বাদ সে ভালো করে বুঝিয়ে দিবে।

অনেক নিষ্ঠুর পুরুষ তো স্ত্রীকে সীমাহীন মারপিট করতেও দ্বিধা করে না। যা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে উঠে। স্ত্রীর উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো নেহায়েত মূর্খতা ও কাপুরুষতা। এটা পুরুষের আত্মমর্যাদারও পরিপন্থী। কেউ কারো কাছে বন্দী এবং তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলে তার উপর শক্তি প্রদর্শন করা বীরত্বের কাজ নয়।

নারীরা বড় দুর্বল ও অসহায়। মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। ফলে সর্বদা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। তবে তারা খুব অভিশাপ দিতে পারে। স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের মুখ খুব চলতে থাকে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তারা মা-বাবার কাছে অভিযোগ করতে যায়, তখন তাদের কাছেও তাদের ঠাঁই নেই। মা-বাবা তাদেরকে ধমক দিয়ে দমিয়ে রাখে। ফলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করা এবং অভিশাপ দেয়া ব্যতীত তাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। আর সেই অভিশাপ এমনই যন্ত্রণাদগ্ধ, যা আল্লাহর দরবারে সাথে সাথে কবূল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মাজলুমের ফরিয়াদ কবূল করতে দেরী করেন না।

হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে, যার কোন সাহায্যকারী নেই, তার সাহায্যকারী আল্লাহ। মাজলুম যখন ফরিয়াদ করে তখন আল্লাহ বলেন ঃ

لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ

"আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও খানিক বিলম্বে।"

স্ত্রীর প্রতি জুলুম নির্যাতনের পরিণাম অনেক সময় দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়। এজন্য তার সাথে সর্বদা সদাচরণ করা উচিত। হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্লচিত্তে তার সামনে নিজেকে পেশ করবে। তার উপর কখনও জুলুম-নির্যাতন চালাবে না। আল্লাহকে ভয় করবে।

অসম্ভব কিছু নয় যে, স্ত্রীর অন্তরের অভিশাপে আল্লাহ তা'আলা কোন বিপদে ফেলে দিতে পারেন। যেমন, কোন মামলা-মোকদ্দমা চাপিয়ে দেয়া, কোন দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত করা কিংবা কোন জালেম শাসক তার উপর চাপিয়ে দেয়া ইত্যাদি। কারণ, অপরের উপর জুলুম করার প্রতিফল মানুষকে সাধারণত দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়।

বিগত জাতিসমূহের উপর তো অপরাধ করার সাথে সাথেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য শাস্তি এসে যেতো। কিন্তু এ উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি কারো উপর প্রকাশ্য শাস্তি আরোপ করেন না। কারণ এটা অধিক অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর। তবে অপ্রকাশ্যে শাস্তি হয়ে যায়। যা দেখে দুনিয়ার মানুষ তার স্থূল কারণ তালাশ করে। অথচ মানুষের কোন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা আপতিত করেছেন। বিশেষত মাজলুম যখন ফরিয়াদ করে, তখন আল্লাহ্ সাথে সাথে তার জবাব দিয়ে দেন।

কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার পরিণতি পরকালেও ভোগ করতে হয়। এক মহিলা একটি বিড়ালকে কষ্ট দিয়েছিলো। সে মারা যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন ঃ "মহিলাটি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং বিড়ালটি তাকে আঁচড় কাটছে।" একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার কারণে যখন একজন মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হলো। তাহলে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম কি হতে পারে, তা ভেবে দেখা দরকার।

স্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেয়া যেমন অপরাধ, অনিচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেয়াও তেমনি অপরাধ।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে দু'মহিলার আলোচনা হলো। একজন সম্পর্কে বলা হলো যে, সে নামাজ-রোজা ও ইবাদত বন্দেগীতে তো বড় যত্নবান। কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তার সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন ঃ

هِىَ فِى النَّارِ

"সে জাহান্নামী।"

অতঃপর অপরজন সম্পর্কে বলা হলো, সে নামাজ রোজায় তো পরিপূর্ণ যত্নবান নয়। কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তার সম্পর্কে তিনি বললেন ঃ

هِىَ فِى الْجَنَّةِ

"সে জান্নাতী।"

অতএব, চিন্তা করা প্রয়োজন যে, কাউকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম কি ভয়াবহ। এজন্য কাউকে কষ্ট না দেয়ার গুরুত্ব নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর গুরুত্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্ত্রী অবাধ্য হলে কি করণীয় ?

যে সকল নারী স্বামীর আনুগত্য করে না কিংবা স্বামীর আনুগত্য প্রদর্শনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, কুরআনুল কারীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের তিনটি উপায় নির্দেশ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۔ (سورة النساء - اية ٣٤)

অর্থাৎ ঃ "স্ত্রীদের পক্ষ হতে যদি কোন অবাধ্যতা সংঘটিত হয় কিংবা সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো, নম্র-কোমল ভাষায় তাদেরকে বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দিবে। যাতে এই পৃথকীকরণের দরুণ সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায়। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে তাদেরকে হালকা প্রহার করবে। এ তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তোমরাও সহনশীলতার পরিচয় দিবে। সাধারণ কথায় কথায় তাদের দোষ ত্রুটি খুঁজতে যেয়ো না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা সবার উপরই পরিব্যাপ্ত।"

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বিরোধ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার নিরসন না হয়ে দীর্ঘায়িত হতে থাকে। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা স্বামীর অহেতুক বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা ইত্যাদির যে কোনটির কারণেই হোক। এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার পথ নির্দেশ করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا ۔ اِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۔

(سورة النساء ۔ اية ۔ ٣٥)

"যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশংকা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিসী নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমস্যার সমাধান ও সমঝোতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" (সূরা নিসা, আয়াত-৩৫)

হাদীস শরীফে আছে ঃ

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ لَكُمْ

"স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট কয়েদীর মত।"

তবে যদি তারা কোন অসংগত আচরণ করে ফেলে, তাহলে প্রয়োজনবোধে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। যদি এতে তাদের সংশোধন না হয়, তবে তাদেরকে হালকা দৈহিক শাস্তি দাও। অতঃপর যদি তারা অনুগত হয়ে যায়, তাহলে আর তাদের দোষ তালাশ করতে যেয়ো না।

মনে রাখবে, স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদের উপরও তাদের কিছু অধিকার রয়েছে।

স্ত্রীকে শাসন করার সীমারেখা

প্রয়োজনবশত স্ত্রীকে শাসন করার অনুমতি রয়েছে। তবে অবশ্যই তা সীমার মধ্যে থাকতে হবে। স্ত্রীর সংশোধনের জন্য সে পরিমাণ শাসনেরই অনুমতি রয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাসন করার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। এ শাসনের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন– তিরস্কার করা, ধমক দেয়া, হাত বা ছড়ি দ্বারা হালকা প্রহার করা, কান টানা, কঠোর কোন শব্দ প্রয়োগ করা, চলা-ফেরার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা, সাময়িকভাবে খরচ প্রদান বন্ধ রাখা ইত্যাদি।

যে শাসন স্ত্রীর দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে যায়, তা শরীয়তে জায়েয নেই। স্ত্রীকে শাসন করার অন্তরালে তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো গুনাহ তো বটেই, উপরন্তু তা মানবতা বিরোধী কাজ। যে প্রহারের দ্বারা চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়, ফিকাহবিদগণ তাকে জায়েয মনে করেন না। আর যদি প্রহারের কারণে হাড় ভেংগে যায় কিংবা চামড়া ফেটে যায়, তাহলে তো তা জঘন্য অপরাধ।

স্ত্রীকে শাসন প্রয়োগে সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো, শুরুতে এটা স্থির করে নিবে যে, তাকে আমি এই এই শব্দ বলবো কিংবা এ পরিমাণ প্রহার করবো। প্রহারের পরিমাণ ঠিক রাখার সহজ পন্থা হলো ঃ ক্রুদ্ধ অবস্থায় স্ত্রীকে শাসন করতে যাবে না। বরং ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাওয়ার পর অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী ভেবে-চিন্তে শাসন প্রয়োগ করবে।

কখনও কারো উপর ক্রোধ বা উত্তেজনা এসে গেলে সাথে সাথে তার সামনে থেকে সরে যাবে কিংবা তাকে সরিয়ে দিবে এবং ঠান্ডা পানি পান করে নিবে। আর যদি উত্তেজনার মাত্রা অতিরিক্ত হয়, তাহলে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করবে যে, মহান আল্লাহর অফুরন্ত নে'আমতরাজী আমরা ভোগ করা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্ত তাঁর সাথে হাজারো নাফরমানী করে চলছি। অথচ আমাদের প্রতি তাঁর ক্ষমা ও উদারতার অন্ত নেই। অতএব, আমাদেরও তো উচিত অপরের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা। অন্যথায় কিয়ামত দিবসে আল্লাহ যদি আমাদের থেকে আমাদের কৃত নাফরমানীসমূহের প্রতিশোধ নিতে যান, তাহলে আমাদের কি উপায় হবে ?

ক্রোধ সম্বরণের উপায়

এক. একবার রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন ঃ পাহলোয়ান কাকে বলে ? উত্তরে সাহাবীগণ বললেন ঃ পাহলোয়ান ঐ ব্যক্তি, যে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারে। তিনি বললেন ঃ না, বরং পাহলোয়ান ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক্রোধের কারণে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটা কোন দূষণীয় নয়। কিন্তু তা দমন করার ক্ষমতাও আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন।

হযরত আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন, আমি একবার কোন প্রয়োজনে উরওয়া ইবনে মুহাম্মদের নিকট গেলাম। কোন কারণে উরওয়ার ক্রোধ এসে গেলো। আবু ওয়ায়েল বলেন ঃ তিনি তৎক্ষণাৎ পানি নিয়ে ওজু করে দু'রাকাআত নামাজ পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন!

"اَلْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ"

"ক্রোধ শয়তানের ক্রিয়া এবং শয়তান আগুন হতে সৃষ্ট।"

বস্তুতঃ ক্রোধের সময় উষ্ণতার উত্তাপই প্রকাশ পায়। চেহারা লাল বর্ণ ধারণ

করে। হাত, পা তথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হয়। এ সবই আগুনের ক্রিয়া। শয়তানকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো ঃ মানব দেহের কোথায় তুমি অবস্থান কর ? সে বললো ঃ মানুষ যখন শান্ত থাকে, তখন তার অন্তরে এবং যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন তার মাথায় অবস্থান করি।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ সম্বরণের যে পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন তা একবারেই যথার্থ। তিনি ঠান্ডা পানি দ্বারা ওযু করার নির্দেশ দিলেন। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়াকে যথেষ্ট বললেন না। কারণ ক্রোধ শুধু আগুন নয় বরং শয়তানের ক্রিয়া যা আগুন থেকে সৃষ্ট। আর আগুন নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় ইবাদত দ্বারা। ইবাদত অহংকারকে দমন করে। আর শয়তানের সমস্ত শয়তানিয়্যাতের মূল উৎস তো অহংকার।

তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ দমন করার এমন এক পন্থা বলে দিলেন, যা আগুন ও অহংকার উভয়টিরই অবদমনকারী। স্বভাবতই বান্দা যখন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে, তখন শয়তান তার থেকে পালাতে বাধ্য হবে।

দুই. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ক্রুদ্ধ হবে, তখন দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে। এতে যদি ক্রোধ দমন না হয়, তাহলে শুয়ে পড়বে।"

এরপর কিছুতেই আর ক্রোধ থাকতে পারে না। কারণ মানুষ যখন দাঁড়ানো থাকে, তখন মাটি থেকে তার দেহের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং বসা অবস্থায় দেহ মাটির কিছুটা নিকটবর্তী হয়ে যায়। অতঃপর শোয়া অবস্থায় দেহ মাটির সাথে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে যায়। আর মাটির প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিনয় ও নম্রতা রেখে দিয়েছেন। ফলে মানুষ মাটির যত বেশি নিকটবর্তী হবে, মাটির প্রকৃতিগত বিনয় ও নম্রতা তার মধ্যে তত বেশি ক্রিয়াশীল হবে। আর বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই ক্রোধ ও অহংকার অবদমিত হয়। এটা যেন বিপরীত বস্তু দ্বারা ক্রোধ অবদমনের চিকিৎসা।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মানুষ ক্রুদ্ধ হলে তার অবচেতন মন এমন আকৃতি ধারণ করতে চায়, যেন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা সহজ হয়ে যায়। যেমন– শয়নরত অবস্থায় কেউ ক্রুদ্ধ হলে অবচেতন মনে সে বসে যায়। ক্রোধের মাত্রা অধিক হলে দাঁড়িয়ে যায়। ক্রোধের স্বভাব দাবীই এটা যে, ক্রুদ্ধ অবস্থায় শোয়া থাকলে বসে যাওয়া এবং বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া। অতএব, ক্রোধের সময় দাঁড়ানো থাকলে বসে যাওয়া এবং বসা থাকলে শুয়ে যাওয়া ক্রোধ দমনের অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা।

তিন. একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুই সাহাবীর একজন অপরজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং দু'জনের কেউ শান্ত হচ্ছিলেন না। তখন তিনি উক্ত দুই সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটি শব্দ জানি, যা উচ্চারণ করলে সাথে সাথে ক্রোধ নিস্তেজ হয়ে যাবে। শব্দটি হলো ঃ أَعُوْذُ بِاللهِ "আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি।"

চার. উলামায়ে কেরাম বলেন, কারো উপর ক্রোধ আসার সাথে সাথে উক্ত স্থান ত্যাগ করলে ক্রোধ আপন থেকেই অবদমিত হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্র ও কারণ সামনে উপস্থিত না থাকলে ক্রোধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে কি করে ?

পাঁচ. ক্রোধ দমন করার আরেকটি পন্থা এই যে, নিম্নোক্ত বাক্যটি এক টুকরা কাগজে লিখে ঘরের এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখবে, যেখানে সর্বদা দৃষ্টি পড়ে। বাক্যটি হলো ঃ

"তোমার যে পরিমাণ ক্ষমতা অপরের উপর, মহান আল্লাহর তার চেয়ে অধিক ক্ষমতা তোমার উপর।"

অপরের উপর ক্রোধ তখনি আসে, যদি তাকে নিজের চেয়ে দুর্বল মনে হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী কিংবা সমশক্তির অধিকারী কারো উপর ক্রোধ আসে না। সুতরাং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তি ও মহত্তের কথা চিন্তা করলে ক্রোধ আসে কিভাবে ?

স্ত্রীকে পরিপূর্ণ সংশোধনের আশা করা অবান্তর

এমন আশা করা একেবারেই অবান্তর যে, স্ত্রী নিজেকে পরিপূর্ণ সংশোধন করে স্বামীর পুরোপুরি অনুগত হয়ে যাবে। কারণ, নারী জাতিকে আল্লাহ প্রকৃতিগতভাবেই বক্রতাসহ সৃষ্টি করেছেন। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যেমন কুকুরের লেজকে বারো বছর চোঙ্গার মধ্যে রাখলেও তা যেমন বাঁকা ছিলো তেমন বাঁকাই থেকে যাবে।

এ জন্য স্ত্রীর তুচ্ছ ও নগণ্য ভুল-ক্রুটির জন্য তার উপর কঠোরতা করা নির্বুদ্ধিতা। তার উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করে রাখা উচিত নয় যে, স্বামী ঘরে পা রাখা মাত্রই সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ বা কোন প্রয়োজনের কথা বলা মাত্রই তাকে হুমকি-ধমকি শুরু করে দেয়া কাপুরুষের কাজ।

সে তো তোমারই জন্য আপন মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন সকলকে ত্যাগ করে এসেছে। এখন তো তার দৃষ্টি একমাত্র তোমারই দিকে। স্বামীই এখন তার সমস্ত আশা-ভরসার প্রতীক। স্বামীর কাছেই যদি তার ঠাঁই না হয়, তাহলে আর কার কাছে ঠাঁই হবে ?

সুতরাং মানবতার দাবী এটাই যে, এমন পরম বিশ্বস্ত বন্ধুকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া, তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসদাচরণকে ক্ষমা-উদারতা ও সহনশীলতার দৃষ্টিতে দেখা। কেননা তার বুদ্ধি জ্ঞান অপরিপক্ব। ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতা কম। কথা বলার যথোপযুক্ত পদ্ধতি তার জানা নেই। ফলে কথা-বার্তায় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। স্বামী মনে করে সে তার সাথে শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করেছে। অথচ বাস্তবে এটা তার স্বামীর সাথে অভিমান ছাড়া কিছুই নয়। স্বামী ছাড়া আর কার সাথে সে অভিমান করতে যাবে ? এ পৃথিবীতে স্বামীই তো তার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

বুদ্ধির অপরিপক্বতা হেতু স্ত্রীর কোন আচরণে কষ্ট পেতে থাকলে তাকে সংশোধন করার ব্যবস্থাও তো আছে। যেমন– তাকে নিয়মিত ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ানো ও শুনানো। এর দ্বারা সে পর্যাপ্ত আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করবে। তার আখলাক ও চরিত্র পরিশোধিত হবে। তার অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি সে স্বামীর হুকুম ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

বাস্তবে যদি স্ত্রীই ভুল করে থাকে, তবুও তাকে ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণসমূহের উপর ধৈর্যধারণ করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, মেজাজ ও তবীয়তে সহনশীলতা সৃষ্টি হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিরাট কল্যাণ সাধিত হয়।

হযরত লোকমান হাকীম (আ) এক ব্যক্তির বাগানে কাজ করতেন। একদিন বাগানের মালিক এসে তাঁর কাছে শশা চাইলো। অতঃপর তা খোসামুক্ত করে এক টুকরা তাঁর হাতে দিলো। তিনি সাথে সাথে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। বাগানের মালিক তাঁকে খুব মজা করে খেতে দেখে ভাবলো, এটা নিশ্চয় খুব মজাদার জিনিস। সে নিজেও এক টুকরা মুখে দিলো। কিন্তু তিতার কারণে তা সাথে সাথে ফেলে দিতে বাধ্য হলো। অতঃপর ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, লোকমান! তুমি প্রচন্ড তিতা এই শশাটা বড় মজা করে খাচ্ছিলে যে? তিনি বললেন, হাঁ! তিতা তো ঠিকই। সে বললো, তাহলে বললে না কেন, এটা যে তিতা? তিনি বললেন, আমি কি বলবো ? ভাবলাম, যে হাত থেকে হাজার হাজার বার মিষ্টি দ্রব্য খেয়েছি, সে হাত থেকে জীবনে একবার তিতা জিনিস খেলে বলার এমন কি আছে ?

লোকমান (আ)-এর এ ঘটনাটি সামনে রাখলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হতে পারে না। দাম্পত্য জীবনে তারা কখনো বিস্বাদ অনুভব করবে না। স্ত্রী মনে করবে, স্বামী অসংখ্যবার আমার প্রতি নম্র কোমল আচরণ করার পর দু'একবার রুক্ষ আচরণ করলে তাতে কি আসে যায়। তদ্রূপ স্বামী মনে করবে, স্ত্রী আমার হাজার রকমের খিদমত করার পর দু'একটি আচরণ আমার মনের খেলাফ করলে তাতে কি হয়!

ভারতবর্ষের নারীদের মধ্যে অসদাচরণ ও শিষ্টাচারহীনতা যেমন আছে, তেমনি তাদের মধ্যে অনেক মহৎ গুণও তো আছে। সে দিকেও তো লক্ষ্য করা উচিত। উক্ত গুণসমূহের দাবী তো হলো, তাদের প্রতি নম্র-কোমল ও উদার-সহনশীল হওয়া, তাদের সাথে বেপরোয়া আচরণ না করা। উপরন্তু তারা স্বামীর বিশ্বস্ত খাদেম। স্বামীকে সুখ ও শান্তি দানে সদা তৎপর থাকে। স্বামীকে আরাম ও শান্তি দানের জন্য যে তার গোটা জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তার দু'একটি কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য করতে না পারা কি চরম অকৃতজ্ঞতা নয় ?

আমাদের পীরানী সাহেবা [হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রা)-এর স্ত্রী] শেষ বয়সে খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তাই গৃহের কাজের জন্য হযরত মক্কা মুআজ্জমায় একজন খাদেমা নিয়ে গেলেন। সে ছিলো এমন উগ্র স্বভাবের যে, সব সময় পীরানী সাহেবার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেতো।

একবার আমার স্ত্রী পীরানী সাহেবাকে বললো, এই খাদেমা আপনার সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করা সত্ত্বেও আপনি তাকে কিছু বলেন না কেন ? তাকে কেন বের করে দেননা ? তিনি বললেন, তার দ্বারা আমি অনেক শান্তি পাই। আর যার দ্বারা শান্তি পাওয়া যায় তার দোষ ত্রুটি বরদাশ্ত না করা অকৃতজ্ঞতা। এজন্য যখন আমি তার দ্বারা কোন কষ্ট পাই, তখন আমার প্রতি তার খিদমতের কথা স্মরণ করে সব কিছু ভুলে যাই। ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, তিনি একজন নারী হয়েও যে কৃতজ্ঞতাবোধ ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন, আমরা পুরুষ হয়ে কি সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারছি ? আমরা কি পারি না স্ত্রীর সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ করে তার দোষ ত্রুটি ক্ষমা-উদারতার দৃষ্টিতে দেখতে ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

অসৎ চরিত্র স্ত্রীর পক্ষে কুরআনুল কারীমের সুপারিশ

আল্লাহ্ তা'আলা কি সুন্দর ভাষায় নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে বলেছেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা-নিসা, আয়াত-১৯)

স্বভাবতই স্ত্রী অপছন্দ হওয়ার পশ্চাতে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে। যেমন অনেক মহিলার নৈতিক চরিত্র ভালো থাকে না। যা পুরুষের জন্য বড়ই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদের এ চারিত্রিক ক্রটি-বিচ্যুতিকে বিপুল কল্যাণে পরিণত করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়। সমস্ত অদৃশ্য খবর সম্পর্কে তিনি অবগত। হতে পারে অসৎ চরিত্রা স্ত্রীর গর্ভে এমন সুসন্তান জন্ম লাভ করবে, যে কিয়ামত দিবসে তার পিতার জন্য নাজাতের ওসীলা হযে যাবে। হাশর ময়দানে এমন অনেক লোক দেখা যাবে, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। তখন শৈশবে মৃত্যুবরণকারী তাদের সন্তান বলবে, "আমার পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমি জান্নাতে যাবো না।" ফলে আল্লাহ তা'আলা তার ওসীলায় তার পিতার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবেন।

অসৎ স্ত্রীর প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণ এভাবেও হতে পারে যে, স্ত্রীর কোন অশালীন আচরণের উপর ধৈর্য ধারণ করলে বিনিময়ে আল্লাহ স্বামীর জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিবেন। মু'মিনের জন্য জান্নাতের চেয়ে বড় কল্যাণ আর কি হতে পারে ? দুনিয়াতে স্ত্রীর দ্বারা যা কিছু কষ্ট আসে, তা তো পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য, ক্ষণিকের জন্য। অথচ ধৈর্যের বিনিময়ে মহান আল্লাহ অফুরন্ত নে'আমতরাশিতে ভরপুর যে জান্নাত দান করবেন তা চিরস্থায়ী, অনন্তকালের জন্য।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত উক্ত নেআমতের কথা চিন্তা করে স্ত্রীর প্রতি সহনশীল হওয়া– সে যতই অসৎ চরিত্রের হোক না কেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রীর প্রতি সহনশীল হতে গিয়ে তাকে সংশোধনের পথও পরিহার করবে। সংশোধনের প্রচেষ্টা তো অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। তবে তা অবশ্যই হতে হবে নম্রতা কোমলতা ও হিত কামনার সাথে। মাঝে মধ্যে হালকা শাসন করারও শরীয়তের পক্ষ হতে অনুমতি রয়েছে। কিন্তু শাসনের অন্তরালে তার প্রতি দৈহিক নির্যাতন চালানো কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত মিরযা জানে জানা(র)-এর ঘটনা।

হযরত মিরযা মাজহার জানে জানা (র) এমন নাযুক ও স্পর্শকাতর স্বভাবের ছিলেন যে, একবার তাঁর এক বৃদ্ধা মুরীদানী (ভক্ত) তাঁর জন্য একটি লেপ সেলাই করে নিয়ে এলো। তখন তিনি শুয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বললেন, লেপটি আমার শরীরের উপর দিয়ে চলে যাও। বৃদ্ধা তাই করলো।

ফজরের নামাজের সময় খাদিমগণ তাঁর চোখ লাল দেখে কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, "রাতে ঘুম হয়নি"। খাদিমগণ বললেন, "ঠান্ডা লেগেছিলো। কি ?' তিনি বললেন, না, লেপ গায়ে দেয়ার কারণে ঠান্ডা তো দূর হয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু লেপে সেলাই আঁকা-বাঁকা থাকার কারণে তবীয়ত খারাপ ছিলো। তাই ঘুম হয়নি।

তাহলে তিনি কেমন স্পর্শকাতর তবীয়তের ছিলেন! রাতের অন্ধকারে মুখ ঢাকা অবস্থায় লেপের সেলাই দৃষ্টিতে না পড়া সত্ত্বেও শরীরের উপর দেয়া মাত্রই আঁকা-বাঁকা অনুভূত হওয়ায় এমন অস্বস্তি বোধ করলেন যে, গোটা রাত ঘুমাতে পারলেন না।

অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলো এমন উগ্র স্বভাবের যে, তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে দ্বিধা করতো না। আচার-আচরণে তাঁকে সীমাহীন উত্যক্ত করতো। কিন্তু তিনি এমন স্পর্শকাতর স্বভাবের হয়েও তার সমস্ত অসদাচরণ নীরবে সহ্য করে যেতেন। কখনও তাকে তালাক দেয়ার কল্পনা করা তো দূরের কথা তাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। উপরন্তু তার প্রতি তাঁর যত্ন ও দায়িত্ববোধ এ পর্যায়ে ছিলো যে, বেগম সাহেবার খোঁজখবর জানার জন্য প্রতিদিন ভোরে খাদিমকে পাঠিয়ে দিতেন। খাদিম মিরযা সাহেবের পক্ষ হতে তার খোঁজ খবর নিতে গেলে সে হযরতকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে যা ইচ্ছা তা

বকাঝকা করতো। খাদিম তাঁর কাছে ফিরে এসে এসব কিছু না জানিয়ে শুধু বলতো, হযরত! তিনি ভালো আছেন।

একবার তিনি ঘটনাক্রমে স্ত্রীর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য এক পাঠান খাদিমকে পাঠালেন। সে তার কাছে গিয়ে তার কথা-বার্তা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গেলো এবং হযরতের নিকট এসে আরয করলো, হযরত! তিনি তো আপনাকে অকথ্য ভাষায় যা ইচ্ছা তা বলে দিয়েছেন। এরপরও আপনি কিভাবে তাকে এ পরিমাণ আদর-যত্ন করেন ?

তিনি বললেন, ভাই! তাকে এভাবে তাচ্ছিল্যের সাথে বলো না। সে তোমাদের তো সম্মানের পাত্রী। আমি এজন্য তাকে এত আদর-যত্ন করি যে, সে আমার বড়ই মুহ্সিন। আমি যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা লাভ করেছি, তা তারই কারণে হয়েছে। তার অসদাচরণগুলো বরদাশ্ত করে নেয়ার কারণেই আল্লাহ আমাকে এ নি'আমত দান করেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ত্রীর সীমাহীন দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণকে সহ্য করে নেয়া তাঁর মত নাযুক ও স্পর্শকাতর ব্যক্তির পক্ষে কতই না কঠিন ব্যাপার ছিলো! কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তিনি সবকিছু নিরবে সয়ে যেতেন।

আল্লাহ ওয়ালাগণের অবস্থা হলো, তাঁরা নিজের শত্রুর অন্তরেও আঘাত দেন না। অথচ শত্রু তো দূরের কথা আমরা পরম বন্ধুর পক্ষ হতে প্রাপ্ত কষ্টকেও মেনে নিতে পারি না। একজন মানুষের জন্য স্ত্রীর চেয়ে পরম বন্ধু আর কে আছে ? স্ত্রীর পক্ষ হতে সামান্য কষ্টদায়ক কোন আচরণকেও আমরা সহ্য করতে পারি না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সহ্য করা সম্ভব না হলেও অন্তত এজন্যও তো সহ্য করে নেয়া উচিত যে, আল্লাহর সাথে কোন নাফরমানী হয়ে গেলে তা উক্ত নাফরমানীর কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

স্ত্রী বদ মেজাজি বা কুশ্রী হলে

স্ত্রী বদ মেজাজি বা কুশ্রী হলে মনে করবে এটা নিজের কৃত গুনাহের কারণে। নিজের কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই আল্লাহ তাকে এরূপ স্ত্রী দান করেছেন।

আমি এক স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনেছি। স্বামী তো বড়ই সুসভ্য ও নম্র-কোমল স্বভাবের ছিলো। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলো চরম বদ মেজাজি ও উগ্র স্বভাবের। একদিন সে উক্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি বড়ই কমবখ্ত (হতভাগা) আমার কাছে তোমার এতদিন কেটে গেলো, অথচ এখনও তোমার সংশোধন হলো না।

সাথে সাথে স্ত্রী বলে দিলো, আমি কেন হতভাগী হবো ? আমার চেয়ে বড় সৌভাগ্যবতী কে আছে ? কারণ, তোমার ন্যায় সুসভ্য পুরুষ আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। হতভাগা তো তুমি। কারণ, আমার ন্যায় এমন বদমেজাজি ও উগ্র স্বভাবের স্ত্রী তোমার ভাগ্যে জুটেছে।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঃ স্বামী তো খুবই সুন্দর-সুদর্শন ছিলো। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলো অত্যন্ত কুশ্রী ও দৃষ্টিকটু। উপরন্তু তার মেজাজও ছিলো চরম উগ্র। আমাদের কেউ হলে তো সাথে সাথেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতো। কিন্তু উক্ত আল্লাহর বান্দা সব কিছু সহ্য করে যেতেন।

একবার কেউ তাকে বললো, এরূপ স্ত্রীকে তুমি তালাক দিয়ে দাও না কেন ? সে বললো, তাকে আমি তালাক দেই কিভাবে ? আসল কথা হলো, আমি জীবনে কোন পাপ করেছিলাম। উক্ত পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ আমাকে এরূপ স্ত্রী দিয়েছেন। আর সে তার জীবনে এমন কোন নেক কাজ করেছে, যার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে আমার ন্যায় সুদর্শন পুরুষ দান করেছেন। আমি হলাম তার নেক কাজের ফল, আর সে হলো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুতরাং তাকে তালাক দেয়ার চিন্তা করি কিভাবে ?

বুযুর্গানে দ্বীন নিজেদেরকে এভাবে বুঝ দিতেন। স্ত্রী যতই কুশ্রী, অসদাচরণকারী ও চরিত্রহীনা হোক না কেন তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার চিন্তা তারা করতেন না। বরং সব কিছু নীরবে সহ্য করে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। অতএব, স্ত্রী বাস্তবে অপরাধী হলেও তার অপরাধসমূহকে ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এর দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই বিরাট ফায়দা পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফে আছে ঃ "সুন্দর পরনারীর প্রতি কারো মন আকৃষ্ট হয়ে গেলে সে যেন সাথে সাথে আপন স্ত্রীকে নিয়ে মশগুল হয়ে যায়।" উল্লিখিত হাদীসে অতঃপর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِىْ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِىْ مَعَهَا

অর্থাৎ "উক্ত নারীর মধ্যে যা আছে নিজ স্ত্রীর মধ্যে তাই আছে।"

মাওলানা ইয়াকূব সাহেব হাদীসের এ অংশের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের ব্যবহৃত বস্তুসমূহ তিন প্রকার। (এক) এমন বস্তু যার উদ্দেশ্য শুধু প্রয়োজন পূরণ, স্বাদ গ্রহণ নয়। যেমন, পায়খানা, পেশাব করা। (দুই) এমন বস্তু যা দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু স্বাদ গ্রহণ। যেমন, পিপাসার্ত না হওয়া

সত্ত্বেও খুবই উৎকৃষ্টমানের সুগন্ধময় শরবত পান করা। এখানে শুধু স্বাদ গ্রহণই উদ্দেশ্য। প্রয়োজন পূরণ নয়। (তিন) এমন বস্তু যার স্বাদ গ্রহণ ও প্রয়োজন পূরণ উভয়টিই উদ্দেশ্য হয়।

এটা পুনরায় দু'প্রকার (এক) এমন বস্তু যাতে প্রয়োজন পূরণের দিকটি প্রবল। যেমন খাবার গ্রহণ এর মধ্যে প্রয়োজন পূরণের দিকটি প্রবল। যদিও স্বাদ গ্রহণও তাতে উদ্দেশ্য থাকে। এজন্যই খাবারের দস্তরখান ও পাত্র উত্তম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু জরুরী নয়। (দুই) এমন বস্তু যাতে স্বাদ গ্রহণের দিকটি প্রবল। যেমন স্ত্রী সহবাস এর মধ্যে প্রয়োজন পূরণের দিকটিও (দেহের অতিরিক্ত বীর্যের স্খলন ঘটানো) উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু স্বাদ গ্রহণের দিকটিই থাকে প্রবল।

অতএব, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম হলোঃ স্ত্রী সহবাসের মধ্যে যদিও স্বভাবগতভাবে স্বাদ গ্রহণের দিকটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা প্রয়োজন পূরণের দিকটিকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নাও। এতেই অধিক শান্তি। প্রয়োজন পূরণটাই যখন হবে স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য, তখন স্বভাবতই নিজের অসুন্দর স্ত্রী ও সুন্দরী পরনারীকে একই মানের মনে হবে। আর ব্যভিচারীর একমাত্র উদ্দেশ্য যেহেতু স্বাদ গ্রহণ। তাই সে দুনিয়ার সমস্ত নারী ভোগ করার পর একজন অবশিষ্ট থাকলে, তার ব্যাপারেও এ কুচিন্তা করতে থাকে যে, হয়ত এর মধ্যে অন্যরকম স্বাদ। ফলে তার অস্বস্তি ও অস্থিরতার অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী সহবাসকে প্রয়োজন পূরণ হিসাবেই গ্রহণ করবে, সে সর্বদা মানসিক স্বস্তি ও শান্তিবোধ করতে পারবে এবং পরনারীর মোহ কখনও তার অন্তরে স্থান পাবে না।

স্ত্রী তালাকের উপযুক্ত হলে

এক বুযুর্গের ঘটনা ঃ তার স্ত্রী তাকে খুবই জ্বালাতন করতো। বিভিন্নভাবে তাকে কষ্ট দিতো। লোকজন এ অবস্থা জানতে পেরে আরয করলো, হযরত! এমন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়াই তো শ্রেয়। তিনি বললেন, তালাক তো দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এটাও চিন্তা করা উচিত যে, আমি তালাক দেয়ার পর অন্য কারো সাথে বিবাহ না হলে গোটা জীবন তাকে কষ্ট পেতে হবে। তার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে।

আর যদি অন্য কারো সাথে তার বিবাহ হয়ে যায়, তাহলে তার দ্বারা উক্ত মুসলমান ভাই কষ্ট পাবে। অতএব, আমি নিজেই কষ্ট করতে থাকি। যেন অন্য

মুসলমান ভাইয়ের জন্য সে কষ্টের কারণ না হয়। আমি বিদ্যমান থাকাবস্থায় অপর মুসলমান ভাই কেন কষ্ট পাবে ?

স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে কিংবা তার হক নষ্ট করতে থাকলে, তা সহ্য করে যাওয়া উচিত। কারণ মহান আল্লাহর অপরিসীম নে'আমত আমরা ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর সাথে আমাদের নাফরমানীর অন্ত নেই। আমাদের সমস্ত অপরাধ ও নাফরমানী তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। তাহলে আমাদেরও কি কর্তব্য নয় অপর মুসলমানের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা? অন্যথায় আল্লাহ তা'আলাও যদি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে যান, তাহলে আমাদের কি উপায় হবে ?

চিন্তা করা উচিত যে, আমরা আল্লাহর গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতি কি পরিমাণ ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করছেন। এমন কোন অপরাধ কি আছে, যা বান্দা আল্লাহর সাথে করছে না ? অথচ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কিরূপ আচরণ করে থাকেন। পাপী তাপী নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে তিনি রিযিক প্রদান করছেন। মানুষ তাঁর সাথে যত জঘন্য থেকে জঘন্যতম অপরাধই করুক না কেন তিনি কারো উপর তাঁর শাস্তি আপতিত করেন না।

কারণ তো এটাই যে, তিনি জানেন, সমস্ত মানুষ তাঁর গোলাম। তিনি ব্যতীত তাদের আর কেউ নেই। মানুষ যা কিছু অপরাধ ও নাফরমানী করছে, নিজেদের অজ্ঞতার কারণে করছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তাহলে আমরা তার অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল বান্দা হয়ে কি পারি না নিজেদের অধীনস্তদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে ?

স্ত্রী নিঃসন্তান বা কন্যাসন্তান প্রসবিনী হলে

স্বামীর এমন রুক্ষ স্বভাবের হওয়া উচিত নয় যে, স্ত্রীর তুচ্ছ ও নগণ্য ভুল-ত্রুটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকবে। অনেকে তো এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে স্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, যাতে স্ত্রীর কোনই ক্ষমতা নেই। এটা নেহায়েত অমানবিকতা।

সন্তান না হলে অনেকে তার ঝাল স্ত্রীর উপর মিটাতে থাকে এবং বলে, 'হতভাগিনী! তোর সন্তান কেন হয়না ?' এখানে বেচারীর কি অপরাধ? সন্তান হওয়া না হওয়া কি তার ক্ষমতার আওতাভুক্ত? রাজা-বাদশা ও আমীর-উমরাগণের সন্তান-সন্ততি না হলে তারা কত রকম যৌন উদ্দীপক ও সন্তান লাভে সহায়ক ঔষধ গ্রহণ করে। কিন্তু তা কোনই কাজে আসে না। সন্তান হওয়া

না হওয়া তো সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। এখানে স্ত্রীর অপরাধ কোথায় ? বরং চিকিৎসকদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বিচিত্র কিছু নয় যে, তারা পুরুষেরই ত্রুটি বলে দিবে।

অনেককে দেখেছি, শুধুমাত্র কন্যাসন্তান হতে থাকলে স্ত্রীকে শাসাতে থাকে 'হতভাগিনী তোমার পেটে শুধু কন্যা আর কন্যা।' অথচ এখানে স্ত্রীর ক্রুটি কোথায় ? এজন্য স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা বড়ই অন্যায় কথা।

সকলেরই জানা থাকার কথা, হযরত খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন, (যার কাহিনী কুরআনুল কারীমের সূরায়ে কাহাফে বর্ণিত হয়েছে) তাকে হত্যা করা তার মা ও বাবা উভয়ের জন্যই কল্যাণকর ছিলো। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, উক্ত বালককে হত্যা করার পর আল্লাহ তা'আলা তার মা-বাবাকে এমন এক কন্যা সন্তান দান করলেন, যার বংশধরের মধ্যে অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিলো।

আল্লাহ যদি কাউকে এমন পুত্রসন্তান দান করেন, যে হযরত খিযির (আ) কর্তৃক নিহত বালকের মত হবে, তাহলে কি উপায় হবে?

মহান আল্লাহর বড়ই মেহেরবাণী যে, তিনি অনেককে শুধু কন্যা সন্তান দান করেন। কারণ, মেয়েরা সাধারণত বংশের জন্য কলঙ্ক হয় না। মা-বাবার আনুগত্যও তারা অপেক্ষাকৃত অধিক করে। ছেলেরা তো আজকাল এমন উগ্র ও উদ্ধত হয় যে, আল্লাহ মাফ করুন তাদের জন্ম হওয়ার চেয়ে না হওয়াই অনেক বাবার কাছে ভালো মনে হয়।

আর আল্লাহ তা'আলা যাকে কোন সন্তানই দান করেন না– না কন্যাসন্তান আর না পুত্রসন্তান, তার জন্য তা-ই কল্যাণকর। কারণ, মানুষের কল্যাণ কোনটির মধ্যে তা তিনিই ভালো জানেন।

আজ এক আল্লাহর বান্দা [হযরত থানবী (রঃ)] নিশ্চিন্ত মনে দ্বীনের খিদমতে লেগে আছে। কারণ, তার কোন সন্তান নেই। আল্লাহ যদি তাকে কোন সন্তান দান করেন, তখন তার কি উপায় হবে ? তখন কি নিশ্চিন্ত মনে এভাবে দ্বীনের খিদমত করা সম্ভব হবে ?

ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততির সাথে হাজারো চিন্তা পেরেশানী লেগে থাকে। কারো কানে ব্যথা, কারো পেটে ব্যথা, কেউ পড়ে গেছে, কেউ হারিয়ে গেছে। এ ছাড়াও আরো কত রকমের পেরেশানী যে মা-বাবাকে পোহাতে হয়, তার অন্ত নেই। অতএব, অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ তাকে (হযরত থানবী (রঃ)-এ সমস্ত

পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখার জন্যই কোন সন্তান দেননি। যেন সে মুক্ত স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্ত মনে দ্বীনের খিদমতে মশগুল থাকতে পারে।

বাস্তবিকই সন্তান-সন্ততির জন্য যে কি পেরেশানী পোহাতে হয়, তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি সৎ ও চরিত্রবান হয়, তাহলে তো ভাল কথা। কিন্তু আজকাল এটা খুবই কম। অন্যথায় তাকে নিয়ে পেরেশানী ও সমস্যার ইয়ত্তা থাকে না। অতঃপর তার বিয়ের বয়স হলে বিয়ের চিন্তা। বিভিন্ন রকমের ঝামেলা ও পেরেশানী অতিক্রম করে যখন তার বিয়ের কাজ সম্পাদন করলো, তখন আবার আরেক চিন্তা যে, তার আর কোন সন্তান নেই। আল্লাহ আল্লাহ করে বিভিন্ন তাবীজ-তুমার ও ঔষধ প্রয়োগে যখন পুণরায় সন্তান লাভ করলো, তখন তার বয়স এ পর্যায়ে এসে পৌছে যে, অনেকের নাতি যৌবনে পৌছে যায়। তখন ছেলে কথায় কথায় বাপকে বেকুব বানিয়ে ছাড়ে। তার খিদমতে অনীহা প্রকাশ করে এবং ছেলে-নাতি সকলে মিলে তাকে মুখের উপর যা ইচ্ছা তা বলে দেয়। আর বেচারা অসহায়ের ন্যায় গৃহের এক কোণে পড়ে থাকে। অপর দিকে শাশুড়ী-বউয়ের ঝগড়া তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এসবই সন্তান লাভ করার পরিণাম। মানুষ কেন অনর্থক সন্তান লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে, তা আমার বোধগম্য নয়। আল্লাহ যাদেরকে নিঃসন্তান রেখেছেন, দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখে তাদের সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। কারণ, যারা সন্তান লাভ করেছে, তারা তো বড় মুসীবতের মধ্যেই আছে।

দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি সান্ত্বনা না আসে, তাহলে অন্তত এটা মনে করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা আমার তাকদীরে রেখেছেন, সেটাই আমার জন্য কল্যাণকর। কে জানে? সন্তান হলে কিরূপ হতো, এতেও যদি সান্ত্বনা না আসে, তাহলে কমপক্ষে এটা মনে করবে যে, সন্তান হওয়া না হওয়ার মধ্যে স্ত্রীর কোন ভূমিকা নেই?

সন্তান লাভের কয়েকটি আমল

এক. "اَلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ" শব্দ দু'টি যদি চলা-ফেরা, উঠা-বসা সব সময় পড়তে থাকে, তাহলে সন্তান লাভে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, তাহলে অনবরত সাতদিন রোজা রাখবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করে প্রতিদিন ইফতারের পর উল্লিখিত শব্দ দু'টি ২১ বার পড়বে। ইনশাআল্লাহ স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চারিত হবে।

দুই. "اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذْ اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُوْرٍ"

উল্লিখিত আয়াতটি চল্লিশটি লবঙ্গের উপর সাতবার পড়ে দম করবে এবং হায়েযের গোছল থেকে ফারেগ হওয়ার পর প্রতিদিন রাতে একটি করে লবঙ্গ পানি ছাড়া চিবিয়ে খাবে এবং এ চল্লিশ দিন স্বামী-স্ত্রী সহবাসে মিলিত হবে।

তিন. স্ত্রী বন্ধ্যা হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি হরিণের চামড়ার উপর গোলাবের পানি ও জাফরান দ্বারা লিখে তাবীজ বানিয়ে গলায় ব্যবহার করবে।

"وَلَوْأَنَّ قُرآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا"

গর্ভ সংরক্ষণের আমল

এক. يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ

উপরোক্ত আয়াতটি গর্ভ হেফাজতে থাকার জন্য খুবই উপকারী। প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতটি তিনবার পড়ে গর্ভ হেফাজতে থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে।

দুই. اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ـ

যদি গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে কিংবা গর্ভ সঞ্চারিতই না হয়, তাহলে উপরোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখে জরায়ূর উপর এমন ভাবে বাঁধবে, যেন আয়াতের সাথে বে-আদবী না হয়। ইনশাআল্লাহ! গর্ভ সংরক্ষিত থাকবে এবং গর্ভ সঞ্চারিত না হলে সঞ্চারিত হবে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
তালাকের বর্ণনা

চূড়ান্ত অপারগতা ছাড়া স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা অন্যায়। অনেকে অতি তুচ্ছ বিষয়কেই তালাক প্রদানের জন্য যথেষ্ট মনে করে। কারণে অকারণে যখন তখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। অথচ কঠিন প্রয়োজন ছাড়া শরীয়ত কাউকে তালাক প্রদানের অনুমতি দেয়নি। হাদীস শরীফে আছে ঃ

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ (ابو داؤد)

"আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক অপছন্দনীয় হালাল কাজ হলো তালাক।" (আবু দাউদ)

স্ত্রীর নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে তালাক প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ـ

"যদি স্ত্রীগণ তোমাদের আনুগত্য করতে শুরু করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে বাহানা তালাশ করতে যেয়ো না।"

কঠিন প্রয়োজন ছাড়া স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ফলে নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়।

(এক) অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। (দুই) বিবাহের নে'আমতের না শোকরী (তিন) স্ত্রী এবং তার পরিবার ও সন্তান সন্ততিদেরকে কষ্টে নিপতিত করা। (চার) স্ত্রীকে লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত করা।

তাছাড়া স্ত্রী যখন তালাকপ্রাপ্তা হয়, তখন সমাজের বিভিন্নজন তাকে বিভিন্নভাবে অভিযুক্ত করতে থাকে। ফলে অন্য কোথায়ও তার বিবাহ হওয়া মুশকিল হয়ে যায়। মোটকথা, তার গোটা জীবন দূর্বিসহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আবার অনেক মহিলাকে দেখা যায় যে, অতি সাধারণ কোন বিষয়কে কেন্দ্র করেই স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে বসে। অথচ চরম অনন্যোপায় হওয়া ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষ হতে তালাক কামনা করা খুবই অন্যায় কথা। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন, "যে নারী কঠিন প্রয়োজন ছাড়া আপন স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের খুশবু হারাম।"

নিজের জন্য তালাক চাওয়া যেমন অন্যায় তেমনি অপর মহিলার জন্য তালাক কামনা করাও অন্যায়। যেমন কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলো, যার অন্য কোন স্ত্রী রয়েছে। তখন উক্ত মহিলা বললো, আমাকে বিবাহ করতে হলে তোমার প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। হাদীস শরীফে অপর মহিলার জন্য এ ধরনের তালাক চাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং আপন তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষ্য ঃ "তুমি নিজের মুসলমান বোনের বাসনের খাবার খাওয়ার জন্য তার তালাক কামনা করো না।"

হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তালাক

অনেকে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সময় এতটুকু চিন্তাও করেনা যে, স্ত্রী কি এখন হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) অবস্থায় না তুহুর (পবিত্রতা) অবস্থায়। কিংবা তুহুর অবস্থায় থাকলেও স্ত্রী সহবাস হয়েছে কি হয়নি। অথচ হায়েয অবস্থায় এবং এমন তুহুর অবস্থায় যাতে স্ত্রী সহবাস হয়েছে তালাক দেয়া না জায়েয। অনুরূপ নেফাস অবস্থায় (অর্থাৎ, সন্তান প্রসব থেকে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন) তালাক দেয়াও জায়েয নেই।

কোন কোন মূর্খ লোক স্ত্রীকে কৌতুকবশত তালাকওয়ালী বলে সম্বোধন করে। আর মনে করে যে, তালাক হয়নি। অথচ এর দ্বারাও তালাক হয়ে যায়।

ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা কোন ওযর নয়। ক্রোধের সময়ও মানুষ শরীয়তের মুকাল্লাফ (অর্থাৎ, তার উপর শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম আরোপিত হবে)। এজন্য ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ক্রোধ সম্বরণ করা খুবই জরুরী। অনেকে তো ক্রোধের বশে এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে, আর মনে করে যে, তালাক হয়নি। কারণ, সে স্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দেয়নি। অত্যন্ত ভালোভাবে মনে রাখা উচিত যে, ক্রোধ তো দূরের কথা হাসি কৌতুকের ছলে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে ঃ

"ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ"

"তিনটি জিনিস এমন, যেখানে কৌতুক অবস্থা এবং কৌতুকহীন ঐকান্তিক অবস্থার হুকুম অভিন্ন। তার মধ্যে একটি হলো তালাক।"

কেউ যদি হাসি-কৌতুকের ছলে স্ত্রীকে বলে ফেলে, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। একবার অথবা দুইবার দিলে তালাকে রাজ'য়ী হবে। অর্থাৎ, ইদ্দত (তিন হায়েয) অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে (যদি তালাক প্রদানের পূর্বে স্বামীর সাথে তার দৈহিক মিলন হয়ে থাকে) এবং এর দ্বারা বিবাহ পুনঃবহাল হয়ে যাবে। আর যদি তিনবার তালাক বলে ফেলে, তাহলে তালাকে মুগাল্লাজা হয়ে যাবে। ফলে বিবাহ পুনঃবহাল করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। উক্ত স্ত্রীর সাথে তার দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তালাকের বর্ণিত হুকুমটি নারীদেরও ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। সাধারণত নারীদেরকে দেখা যায়, স্বামীর মেজাজ-তবীয়তের প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখে না। অনেক সময় স্বামীর মন মেজাজ ভালো থাকেনা। ফলে সে স্ত্রীকে কিছু বললে সেও পাল্টা জবাব দিতে থাকে এবং জবাব দান হতে মোটেই নিবৃত্ত হয় না বরং কথা শুধু বাড়াতেই থাকে। তখন এক পর্যায়ে স্বামী উত্তেজিত হয়ে তালাক দিয়ে বসে। এমন ঘটনা তো অহরহ ঘটছে যে, ক্রোধ ও উত্তেজনাবশত তালাক হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে থাকে। তালাকের ফলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নয় বরং উভয়ের পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠে।

কোন কোন মহিলা এমন নির্বোধ যে, কারণে অকারণে স্বামীকে বলে ফেলে, তালাক দিয়ে দাও। তখন তালাক দেয়া ছাড়া স্বামীর আর কোন উপায় থাকেনা।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই মনে রাখা উচিত, তালাকের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাই সমীচীন নয়। চাই হাসি-কৌতুকবশত হোক কিংবা ক্রোধবশত হোক। তালাক শব্দটি সম্পূর্ণ বন্দুকের গুলীর মত। হাসিকৌতুকের ছলে বন্দুকে চাপ দিলে যেমন গুলী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে, তেমনি ক্রোধবশত চাপ দিলেও গুলী লক্ষ্যবস্তু ভেদ করতে ভুল করে না।

ক্রোধ ও উত্তেজনার বশে আত্মনিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যাওয়াকে ইসলামী শরীয়ত কিংবা অন্য কোন আইন ওযর হিসাবে গণ্য করে না।

তাই নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ক্রোধ অবদমিত করার ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করবে। শরীয়ত নির্দেশিত উক্ত ব্যবস্থা সমূহ অর্থহীন নয়। আমাদেরই কল্যাণের জন্য ইসলাম তা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে।

তালাক দেয়া কখন আবশ্যক

অনেকে তালাক দেয়াকে এমন দূষণীয় ও অবমাননাকর মনে করে যে, কঠিন প্রয়োজন সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক দেয় না। চাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতই বিরোধ চলতে থাকুক, কিংবা দাম্পত্য জীবনের অধিকার বিনষ্ট হতে থাকুক অথবা স্ত্রীর মধ্যে ক্ষমার অযোগ্য ধর্মহীনতা বিদ্যমান থাকুক।

স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতিকর হয় কিংবা স্ত্রী সম্পূর্ণ বে-নামাজী হয়, তাহলে ফিকাহবিদ্‌গণের মতে উক্ত স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা মুসতাহাব। আর যদি স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে অক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহলে তালাক প্রদান করা ওয়াজিব (রাদ্দুল মুহ্‌তার)। তবে স্ত্রী যদি তার অধিকারের দাবী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তাহলে ভিন্ন কথা।

ইসলামী শরীয়তে তালাকের এ সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক মর্যাদা ও ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে অনেকে তালাক প্রদানকে একটি নিন্দনীয় কাজ মনে করে। ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোটা দাম্পত্য জীবন কষ্ট ও দুর্ভোগের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

বিশেষ প্রয়োজনবশত তালাক প্রদান দূষণীয় কোন কাজ নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ তা মুসতাহাব, আবার ক্ষেত্রবিশেষ তা ওয়াজিব। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

"তোমরা যদি (প্রয়োজনবশত) স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান কর, তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।"

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা) কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। অতঃপর তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁকে তালাক প্রদান করা হতে বিরত থাকেন। এমনিভাবে তালাক প্রদানের অনেক ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ঘটেছে।

অতএব, তালাক প্রদানকে সার্বিকভাবে দূষণীয় বলা যায় না। বরং তা দূষণীয় তো তখন, যদি তালাকের গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না থাকে।

তালাকের সংখ্যা ও রুজু করার হুকুম

"এক তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে বিবাহ পূর্বানুরূপ বহাল থাকে।"

অনেকে এ মাসআলাটির সঠিক মর্মার্থ বুঝতে না পেরে মনে করে যে, যতবারই তালাক প্রদান করা হোক, প্রতিবারই স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয। অথচ সঠিক মাসআলাটি নিম্নরূপ ঃ

তালাকের সর্বোচ্চ সংখ্যা তিনটি। চাই একবারে প্রদান করা হোক কিংবা দুইবারে কিংবা তিনবারে এবং চাই দুই তালাকের মাঝে রাজ'আত করা হোক বা না হোক।

অতএব, যদি কেউ এক তালাকে রাজ'য়ী দেয়ার পর রাজ'আত (স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া) করে, তাহলে তা জায়েয। কারণ, তা এক তালাকের পর হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় তালাকে রাজ'য়ী দেয়ার পর রাজ'আত করলে তাও জায়েয। কারণ, এটা দুই তালাকের পর হয়েছে। দুই তালাকের পর এ জন্য বলা হলো যে, দ্বিতীয় তালাকের সাথে প্রথম তালাকও গণ্য হবে। যদিও প্রথম তালাকের পর রাজ'আত হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, রাজ'আতের দ্বারা তালাকের ক্রিয়া নিঃশেষ হয়ে গেলেও তার মূল তালাক অবশিষ্ট থেকে যায়। অতঃপর তৃতীয় তালাক দেয়ার পর আর রাজ'আতের সুযোগ থাকবে না। কারণ, পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী এ রাজ'আত তিন তালাকের পর হচ্ছে। আর তিন তালাকের পর রাজ'আত জায়েয নেই।

এমনিভাবে যদি এক অথবা দুই তালাকের পর রাজ'আত না করে এবং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে যায়। অতঃপর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় উভয়ে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তখন ঘটনাক্রমে তালাক প্রদান করলে তার সাথে পূর্বের তালাক গণ্য হবে। পূর্বের ও পরের প্রদত্ত তালাক তিনের সংখ্যায় পৌঁছে গেলে তখন আর রাজ'আতের অবকাশ থাকবে না। রবং তালাকে মুগাল্লাজা হয়ে যাবে।

এক সাথে তিন তালাকের হুকুম

তালাক প্রদানের ব্যাপারে একটি বড় ধরনের ভুল এই যে, যখন কেউ তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন একসাথে সম্পূর্ণ তিন তালাক দিয়ে বসে। তিন তালাক না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করতে পারে না। এটা শরীয়তে সম্পূর্ণ না-জায়েয।

পার্থিব বিচারেও একসাথে তিন তালাক দেয়া চরম অদূরদর্শিতা। কারণ, তালাক দেয়ার পর অনেক সময় অনুশোচনা আসে। এক বা দুই তালাক দেয়ার পর তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে কৃত ভুল শোধরে নেয়ার সুযোগ থাকে। তালাকে

বায়েনা দিয়ে থাকলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলেও স্ত্রীর সম্মতিক্রমে পুর্নবিবাহের অবকাশ থাকে। (চাই ইদ্দতের মধ্যে হোক কিংবা ইদ্দতের পরে হোক এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রী হালাল হওয়া শর্ত নয়) কিন্তু সম্পূর্ণ তিন তালাক দিয়ে ফেললে উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও তা আর শোধরানোর সুযোগ থাকে না– যতক্ষণ না তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত স্ত্রী হালাল হবে। তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক হালাল হওয়ার পরও তা শোধরানোর কোন নিশ্চয়তা থাকে না। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তি তালাক প্রদান করবে কি করবেনা তার কি নিশ্চয়তা আছে? আর যদি কেউ হালালকারীর উপর এ শর্তারোপ করে যে, সে দৈহিক মিলনের পর তালাক দিয়ে দিবে, তাহলে তো এ ধরনের শর্তারোপকারীর উপর হাদীসে লানৎ এসেছে– হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হচ্ছে উভয়ের উপর। ফিকাহ্‌বিদগণ এ ধরনের শর্তারোপ করাকে মাকরূহ তাহ্‌রীমী বলেছেন।

কেউ যদি তালাক প্রদানের শর্তারোপ করে, তবুও তালাক দেয়া না দেয়া সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ারে থাকবে। প্রথম তালাক প্রদানকারী স্বামী ও তালাক- প্রাপ্তা স্ত্রীর কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর হুকুম

স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর তার সাথে স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। তাকে নিয়ে উঠা-বসা, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। ক্রোধের বশে মানুষ সাধারণত স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে অতঃপর লজ্জা ও আত্মসম্মানের ভয়ে তা চেপে রাখার চেষ্টা করে। তিন তালাক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে নিজ ঘরে স্ত্রী বানিয়ে রাখে। স্বামী-স্ত্রীর কোন আচরণ করতেই দ্বিধা করে না। কারণ, স্ত্রীকে বিছিন্ন করে দেয়ার ফলে লজ্জা ও দুর্নাম কামাতে হবে। অথচ এতে লজ্জা ও দুর্নাম স্ত্রীকে বিছিন্ন করে দেয়ার লজ্জা ও দুর্নামের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। দুনিয়াতে তো অবধারিত রূপে আছেই। আর পরকালে যে এর জন্য কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হবে, তা তা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু এটা দ্বীন ও শরীয়তের বিরুদ্ধে চরম স্পর্ধা প্রদর্শনের ।মিল।

হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করে এভাবে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা সুস্পষ্ট হারাম। স্ত্রীও যদি তালাকপ্রদানকারী স্বামীর অনুরূপ হয়ে যায়, তাহলে নির্বিঘ্নে যিনা-ব্যভিচারের আস্তানা কায়েম হয়ে যায় এবং হারাম (জারয) সন্তান হতে থাকে। আর স্ত্রী যদি আল্লাহভীরু হয় এবং স্বামীর কাম চাহিদা চরিতার্থকরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন শুরু হয়ে যায় তার উপর চরম

জুলুম নির্যাতন। ফলে দুটি অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে। একটি হলো ব্যভিচার এবং অপরটি স্ত্রীর উপর নির্যাতন। তাই স্ত্রীর কর্তব্য এ ধরনের পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা এবং যতক্ষণ না জীবনের উপর আশংকা দেখা দেয়, তার সাথে কিছুতেই আপোষ না করা।

যাদের মধ্যে কিছুটা দ্বীনদারী আছে, তারা তো এ অবস্থার কিছু একটা সমাধান চিন্তা করে। চাই তা শরীয়ত সম্মত হোক বা না হোক। যেমন– কোন তথাকথিত মুজতাহিদ থেকে শুনে নিলো যে, এক সাথে তিন তালাক প্রদান করলে এক তালাকই গণ্য হয়। আর এক তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার হালাল হওয়া শর্ত নয়। অতঃপর উক্ত ফতোয়ার সপক্ষে বলতে থাকলো, আর যাই হোক, ফতোয়া যিনি দিয়েছেন, তিনিও তো আলিম। অথচ এ কথা সুনিশ্চিত ভাবেই জানা আছে যে, ফতোয়াদানকারী ভুল ফতোয়া দিয়েছে। তার ফতোয়ার উপর আমল করা না-জায়েয।

আর যাদের মধ্যে দ্বীনদারী নেই, তারা বিভিন্ন মূর্খতাসূলভ কথা-বার্তা আবিষ্কার করে ফতোয়াদানকারী আলিমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলে যে, জনাব! তালাক দেয়ার উদ্দেশ্য তো আমার মোটেই ছিলো না।

অথচ তালাকের স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র তালাক হয়ে যাবে। তাতে নিয়ত শর্ত নয়। আবার কেউ বলে, এমনিতেই তালাকের শব্দ মুখে এসে গিয়েছিলো। আমি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে তা বলিনি। অথচ তালাক তো ক্রোধ ও উত্তেজনা অবস্থায়ই হয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে কে তালাক দিতে যায়?

একশ্রেণীর তথাকথিত ভদ্রলোকেরা মনে করে যে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাওয়ার পর উভয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে না ভালো কথা; কিন্তু পূর্বানুরূপ এক ঘরে অবস্থান করলে অসুবিধা কি? স্বামী পূর্বের ন্যায় তার যাবতীয় খরচ বহন করবে। তাহলে তার তালাকপ্রাপ্তা হওয়া প্রকাশ পাবে না। আবার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহেরও প্রয়োজন হবে না। অনেক স্থানে তো স্ত্রী নিজেই এ জাতীয় আবেদন করে থাকে।

এটা মোটেই উচিত নয়। এর দ্বারা বহুবিদ ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। কারণ, উভয়ে এক ঘরে অবস্থান করলে বিচিত্র কিছু নয় যে, কখনও দু'জনে একত্রিত হয়ে যাবে। যেখানে তারা ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। ফলে বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়ার অপরাধে লিপ্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। অতঃপর যেহেতু দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বৈবাহিক সুত্রে খোলামেলা সম্পর্ক ছিলো, সেহেতু অপরাপর বেগানা নারীর তুলনায় তাদের মধ্যে এ আশংকা অনেক বেশী যে, তারা উভয়ে কোন ফিৎনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে যাবে।

তা ছাড়া এখানে এ সমস্যা তো আছেই যে, পুরুষকে গোটা জীবনের জন্য উক্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে হবে এবং নারীকে নতুন কোন স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। আর এ উভয়টিই কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

তালাক ও ইদ্দতের কয়েকটি মাস্‌আলা

এক. তালাক তিন প্রকার। রাজ'য়ী ,বায়েন, মুগাল্লাজ। "তালাকে রাজ'য়ী" এর পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে বিবাহ বহাল থাকবে। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েয নেই। ইদ্দতের মধ্যে যদি রুজু না করে, তাহলে বিবাহ ভেংগে যাবে এবং তখন অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েয হবে।

"তালাকে বায়েন"-এর পর ইদ্দতের ভিতরেও রুজু করার সুযোগ থাকে না। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পেতে হলে বিবাহ দোহরানো আবশ্যক। স্ত্রী নতুন স্বামী গ্রহণ করতে হলে তা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর হতে হবে।

"তালাকে মুগাল্লাজ"-এর পরও রুজু করার আর সুযোগ থাকে না। স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তালাকে মুগাল্লাজপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার একমাত্র পথ হলো ঃ ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ এবং দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক অন্তত একবার দৈহিক মিলন অতঃপর স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান।

দুই. ইদ্দত ঃ বিবাহের পর দৈহিক মিলনের পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। কারণ ইদ্দত পালন করতে হয় জরায়ূ খালি করার জন্য। আর এখানে দৈহিক মিলন না হওয়ার কারণে জরায়ূ এমনিতেই খালি আছে।

স্বামী-স্ত্রী দৈহিক মিলনের পর তালাক হলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। বয়সের স্বল্পতার কারণে যদি এখনো মাসিক রক্তস্রাব শুরু না হয়ে থাকে কিংবা বার্ধক্যের কারণে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে মাসের হিসাব করে ইদ্দত পালন করবে। অর্থাৎ, তার ইদ্দত তিন মাস। আর যদি মাসিক রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে, তাহলে তার ইদ্দত তিন হায়েয। গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যদি কারো স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে গর্ভ অবস্থায় না থাকলে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। আর যদি গর্ভাবস্থায় থাকে, তাহলে এখানেও তার ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিবাহ বিচ্ছেদের বর্ণনা

বিবাহ বিচ্ছেদের অনেকগুলো ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে মুসলিম বিচারকের ফয়সালা অপরিহার্য। যেমন (এক) স্বামী নপুংসক হলে। (দুই) স্বামী পাগল হলে। (তিন) স্বামী লা-পাত্তা হয়ে গেলে। (চার) স্বামী যদি উপস্থিত থেকেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দাম্পত্য অধিকার আদায় না করে। (পাঁচ) স্বামী যদি স্ত্রী থেকে দূরে অবস্থান করে এবং তার পার্থিব ও দৈহিক প্রয়োজন পূরণ না করে।

এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য শরয়ী আদালতের রায় অপরিহার্য। স্ত্রী কিংবা তার অভিভাবকগণের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ইখতিয়ার নেই। বরং স্ত্রী বা তার পক্ষ হতে তার অভিভাবকগণ শরয়ী আদালতে অভিযোগ দায়ের করবে। আদালত শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় পরিপূর্ণ তদন্ত চালিয়ে রায় প্রদান করবে। আদালতের রায় ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর হবে না।

বর্তমানে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যেহেতু প্রায় অনুপস্থিত। নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল ভিত্তিক ইসলামী আদালত থাকলে সেখানে তো বিষয়টির সমাধান সহজ। কিন্তু যেখানে ইসলামী আদালত নেই সেখানে বিচারকাজে নিয়োজিত সাধারণ জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারপতিগণ বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা প্রদান করবে। তবে শর্ত হলো তাদেরকে অবশ্যই শরীয়তী আইন অনুযায়ী ফয়সালা দিতে হবে। তারা শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিলে তা ইসলামী আদালতের ফয়সালার স্থলাভিষিক্ত হবে।

কিন্তু ফয়সালা বা রায় প্রদানকারী বিচারক অমুসলিম হলে তার রায় গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, মুসলমানের উপর বিচার কার্য পরিচালনা করার যোগ্যতা অমুসলিম রাখে না। এমনকি যদি মুকাদ্দমার প্রাথমিক কাগজপত্র অমুসলিম প্রস্তুত করে দেয় এবং মুসলিম বিচারক ফয়সালা দান করে কিংবা তার বিপরীত হয়, তাহলেও উক্ত ফয়সালা গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি ফয়সালা করে দেয়ার ক্ষমতা একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বা বোর্ডের উপর অর্পিত হয়, তাহলে বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক। একজন সদস্য অমুসলমান থাকলেও বোর্ডের সিদ্ধান্ত শরীয়তে গ্রহণ যোগ্য নয়। এ ধরনের সিদ্ধান্ত দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না।

যদি শরয়ী বিচারক না থাকে, তাহ্লে সরকারের কাছে আবেদন জানাবে, সরকার যেন প্রতিটি অঞ্চলে বিশিষ্ট আলিম-উলামাগণের নির্বাচনের ভিত্তিতে একজন সচেতন ও দ্বীনদার আলিমকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ফয়সালার জন্য বিচারক নিয়োগ করে। যার ভাতা ও যাবতীয় খরচ মুসলমানগণ নিজেরা বহন করবে। এরূপ করে নিতে পারলে তো বিষয়টি সহজ হয়ে গেলো। অন্যথায় সমস্যার অন্ত থাকবে না।

যেমন আমি (হযরত থানবী রঃ) একবার লাপাত্তা হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির স্ত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম যে, উক্ত মহিলা ইমাম মালেক (র)-এর নির্ধারিত সময় সীমা অতিবাহিত করার পর সরকারের নিকট আবেদন করবে। সরকার তার সমস্যার সমাধানের জন্য একজন আলিম নিয়োগ করবে। অতঃপর উক্ত আলিম সিদ্ধান্ত প্রদান করে বলবে যে, আমার মতে লা-পাত্তা হয়ে যাওয়া ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। তখন মহিলা স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পালন করে ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে।

কিন্তু তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তারা সরকারের নিকট আবেদন জানালে সরকার জবাব দিয়েছেঃ "ধর্মীয় বিষয়সমূহে আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাইনা।" তাহলে বিষয়টি কেমন জটিল রূপ ধারণ করলো!

এ জন্য যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শরয়ী আদালতের রায় অপরিহার্য, সে সকল ক্ষেত্রে দ্বীনদার আলিম নিয়োগ করার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। হালাল হারামের প্রশ্ন। আর যেহেতু এটা সমস্ত মুসলমানের জন্যই প্রয়োজন। তাই তাতে ছওয়াব অনেক বেশি।

যদি কোথায়ও মুসলিম আদালত না থাকে। কিংবা থাকলেও অভিযোগ দায়ের করার মত আইনগত কোন সুযোগ না থাকে। অথবা মুসলিম আদালত থাকলেও সেখানে শরয়ী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা না হয়। সেখানে যথাসাধ্য খুলা (অর্থের বিনিময়ে তালাক গ্রহণ) করার চেষ্টা করবে। কিন্তু স্বামী যদি কোন কিছুই মেনে নিতে রাজী না হয়, তখন একান্ত অপারগতাবশত ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী দ্বীনদার মুসলমানদের পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ পেশ করবে। এলাকার দ্বীনদার মুসলমানদের পঞ্চায়েত যাদের সংখ্যা ন্যূনতম তিনজন হবে– বিষয়টি তদন্ত করে শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিবে। এটাও শরয়ী আদালতের রায়ের অনুরূপ।

হানাফী ইমামগণের মতে বিশেষ প্রয়োজনবশত অন্য ইমামের মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া জায়েয। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য যেখানে

সেখানে নিজের ইচ্ছামত অন্য মাযহাব গ্রহণ করার অনুমতি নেই– যে পর্যন্ত না বিজ্ঞ আলিমগণ অন্য ইমামের মাযহাব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিবেন। প্রয়োজন সেটাই বিবেচিত হবে, যাকে বিজ্ঞ আলিমগণ প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করবেন।

শরয়ী পঞ্চায়েতের শর্ত

শরয়ী পঞ্চায়েতের জন্য ফাতাওয়ায়ে মালেকিয়ায় ন্যায়-নিষ্ঠাবান মুসলমান হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। ন্যায়-নিষ্ঠাবান দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ফাসেক নয়। অর্থাৎ, কবীরা গুনাহ হতে পূতপবিত্র, ছগীরা গুনাহ বারবার তার থেকে প্রকাশ পায় না এবং কখনও গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে নেয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি সুদ-ঘুষ গ্রহণ করে, দাড়ি মুন্ডায়, মিথ্যা বলে, ওয়াদা ভংগ করে এবং নামাজ-রোজার পাবন্দী করে না, সে শরয়ী পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারে না। কারণ, মাসআলাটি ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাবের। তাই উক্ত মাযহাবের শর্তসমূহও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

হানাফী মাযহাব মতে কাজী বা বিচারকের জন্য ন্যায়-নিষ্ঠাবান হওয়া শর্তের পর্যায়ে না হলেও ন্যায় নিষ্ঠাবান নয় এমন ব্যক্তির ফয়সালা গ্রহণ করা হারাম। এ জন্য হানাফী মাযহাব অনুযায়ীও ন্যায়-নিষ্ঠাবান নয় এমন ব্যক্তিকে শরয়ী পঞ্চায়েতের সদস্য বানানো জায়েয নেই। মোটকথা, পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্য দ্বীনদার, পরহেযগার ও মুত্তাকী হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং শরয়ী সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত গঠন করতে হলে প্রথমত চেষ্টা করবে পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যই যেন আলিম হয়। এটা সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে একজন বিজ্ঞ আলিমকে অবশ্যই পঞ্চায়েতের সদস্য নিয়োগ করবে যার সাথে প্রতিটি বিষয়ে পরামর্শ করে ফয়সালা প্রদান করবে। যদি একজন আলিম সদস্যও না থাকে, তাহলে উক্ত পঞ্চায়েতের শরয়ী ফয়সালা দেয়ার অধিকার থাকবে না। তবে যদি উদ্ভূত বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছু পঞ্চায়েত বহির্ভূত কোন বিজ্ঞ আলিমের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং তার মতামত অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যদি নিজেরা মনগড়া ফয়সালা দিয়ে দেয়, তাহলে তা ঘটনাক্রমে সঠিক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী দ্বীনদার না হয়, তাহলে তারা কতিপয় দ্বীনদার ব্যক্তি মনোনীত করে তাদের উপর শরয়ী ফয়সালার ভার অর্পণ করবে।

প্রভাবশালীদের অংশীদারিত্ব আবশ্যক না হলেও তাদের প্রভাবের কারণে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান সহজ হবে। এতে কাজও হয়ে যাবে এবং প্রভাবশালীরা সাওয়াবও পেয়ে যাবে।

উল্লিখিত শরয়ী পঞ্চায়েত সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় প্রদান করলে তা ইসলামী আদালতের রায়ের সমতুল্য হবে। আর আল্লাহ না করুন যদি তাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, তাহলে অংশ বিশেষের রায় অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। শরয়ী পঞ্চায়েতের রায় তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়। অংশ বিশেষের রায়ের কোন গুরুত্ব নেই। কারণ, তা শুদ্ধ হওয়ার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ ব্যতীত কোন রায় সঠিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে পঞ্চায়েত সদস্যগণের মাঝে মতভেদ হয়ে গেলে স্ত্রী বিষয়টি পুনঃতদন্ত করে দেখার দাবী করতে পারবে। পুনরায় তদন্ত করতে গিয়ে যদি পঞ্চায়েত সদস্যগণের কাছে স্ত্রীর দাবীর সপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ প্রতিভাত হয়, তাহলে এখন বিবাহ বিচ্ছেদের রায় প্রদান করবে। আর যদি নতুন কোন কিছু প্রমাণিত না হয়, তাহলে শুধু তার দাবীর উপর ভিত্তি করে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবে না।

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দিলে

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ পূরণ না করে, তাহলে উক্ত মহিলা একান্ত অনন্যোপায় হয়ে ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাব অনুসরণ করতে পারবে।

তবে প্রথমত সে চেষ্টা করবে বিনিময় দিয়ে হলেও উক্ত ব্যক্তি হতে তালাক গ্রহণ করার। এটা যদি কোন মতেই সম্ভব না হয়, তাহলে অপারগ হয়ে ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাবের উপর আমল করবে।

ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাব হলো, স্ত্রী তার অভিযোগ ইসলামী আদালতে কিংবা মুসলিম বিচারকের কাছে অন্যথায় শরয়ী পঞ্চায়েতের কাছে পেশ করবে। আদালত শরীয়ত স্বীকৃত পন্থায় তদন্ত চালিয়ে স্ত্রীর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযুক্তকে নির্দেশ দিবে "তুমি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা কর কিংবা তাকে তালাক প্রদান কর। অন্যথা আমরা বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা দিয়ে দেব।" যদি সে কোনটিই গ্রহণ না করে, তাহলে আদালত বা আদালতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তার পক্ষ হতে তালাক প্রদান করবে।

অতঃপর ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে তাকে তার কাছেই থাকতে হবে। চাই তার সম্মতি থাকুক বা না থাকুক। কারণ, রাজ'আতের জন্য স্ত্রীর সম্মতি থাকা আবশ্যক নয়। তবে সর্তকতার জন্য বিবাহ দোহ্‌রিয়ে নেয়া উত্তম। কিন্তু ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। তবে উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে পুনর্বিবাহ হতে পারে।

অনেক নারীকে দেখা যায়, ভরণ-পোষণে সামান্য সংকট হওয়া মাত্রই স্বামী থেকে বিচ্ছেদ কামনা করতে থাকে। মনে রাখা উচিত, ভরণ-পোষণে সীমাহীন সংকটের কারণে কোন কোন ইমামের মতে বিবাহ ভেংগে দেয়া জায়েয হলেও তার জন্য তো শরয়ী আদালতের সিদ্ধান্ত আবশ্যক। শরয়ী আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন অবকাশই নেই।

তা ছাড়া আমাদের ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে তো স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানে স্বামী অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আদালতের বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা দেয়ার অধিকার নেই। বরং আদালত স্ত্রীকে নির্দেশ দিবে, সে যেন স্বামীর যিম্মায় করজ নিয়ে নিজের প্রয়োজন নিবারণ করে।

স্বামী অনুপস্থিত হয়ে থাকলে

স্বামী যদি স্ত্রী থেকে অনুপস্থিত হয়ে থাকে এবং তার অবস্থানক্ষেত্র স্ত্রীর জানা থাকে; কিন্তু সে স্ত্রীর কাছে উপস্থিত না হয়, তাকে নিজের কাছে নিয়েও না যায়, তার ভরণ-পোষণের খোঁজ-খবর না নেয় এবং তাকে তালাকও না দেয়। ফলে তাকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। এ জাতীয় মহিলার জন্য কঠিন প্রয়োজনবশত ইমাম মালেক(র)-এর মাযহাব অনুযায়ী নিম্নোক্ত পন্থা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

পন্থাটি হলো ঃ প্রথমে শরয়ী আদালতে কিংবা শরয়ী আদালতের স্থলাভিষিক্ত যে হবে তার কাছে অভিযোগ পেশ করবে এবং স্বাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অনুপস্থিত স্বামীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক সাব্যস্ত করবে। অতঃপর প্রমাণ করবে যে, সে তাকে তার ভরণ-পোষণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে; অথচ সে তাকে তা মাফ করে দেয়নি এবং তা প্রমাণে শপথ করে বলবে। অতঃপর যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যয়ভার বহন করে, তাহলে তো ভালো কথা। অন্যথায় আদালত উক্ত ব্যক্তির প্রতি হুকুম জারি করে বলবে, "তুমি হয়ত নিজে উপস্থিত হয়ে স্ত্রীর হক আদায় কর, কিংবা তাকে কাছে নিয়ে নাও, অথবা যথাস্থানে থেকে তার ভরণ-পোষণের

ব্যবস্থা কর, কিংবা তাকে তালাক প্রদান কর। যদি তুমি উল্লিখিত কোন পন্থা গ্রহণ না কর, তাহলে তোমার বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।"

উক্ত সর্তককারী নোটিশ সত্ত্বেও যদি স্বামী কোন জবাব না দেয়, তখন আদালত একমাস অপেক্ষা করার নির্দেশ দিবে। এ সময়ের মধ্যেও যদি অভিযোগকারিনীর অভিযোগ দূর না হয়, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ফয়সালা দিয়ে দিবে।

যেহেতু বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীর পক্ষ হতে দাবী উত্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তাই অভিযুক্ত স্বামীর পক্ষ হতে জবাব আসার পর স্ত্রী যদি দাবী প্রত্যাহার করে, তাহলে আর আদালতের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ইখতিয়ার থাকবে না।

আদালত অভিযুক্ত স্বামীর কাছে যে নির্দেশ পাঠাবে, তা ডাকযোগে পাঠানো যথেষ্ট নয়। বরং দুই জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত নির্দেশ শুনিয়ে তা তাদের হাওয়ালা করে দিবে। তারা তা নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে শুনিয়ে তার কাছে জবাব তলব করবে এবং সে হাঁ কিংবা না সূচক যা কিছু জবাব (মৌখিক বা লিখিত আকারে) দিবে, তা ভালোভাবে সংরক্ষণ করবে। বরং মৌখিক জবাব হলে সর্তকতার জন্য তা লিখে নিবে, যেন আদালতে এসে হুবহু তা পেশ করতে পারে। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জবাবদানে বিরত থাকে, তাহলে সাক্ষীদ্বয় আদালতে তা-ই পেশ করবে। মোটকথা, সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত রায় প্রদান করবে।

আর যদি অভিযুক্ত স্বামী এমন দূরে কোথায়ও অবস্থান করে, যেখানে কাউকে পাঠানো সম্ভব নয়। তাহলে আদালত অনন্যোপায় হয়ে অভিযোগ সত্যাসত্য যাচাই ও তদন্ত করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ফয়সালা প্রদান করবে।

وصلى الله على النبي وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين - امين يا رب العالمين -